অবচেতন

সমরেশ বসু

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯

প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০

প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯

সাহিত্যিক, একদা তুমি আমার ছাত্র ছিলে, এখন বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কথাটা যে নিতান্ত সাধারণ অর্থে বলিনি, তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ। মাস্টারমশাইরা যেভাবে বয়সকালে ছাত্রদের বন্ধু হয়ে ওঠেন, আমি তা ভেবে বলিনি। ইদানিং তোমার সঙ্গে মেলামেশায়, তোমার জীবন-চিন্তা বা সাহিত্য-চিন্তা, অথবা তোমার ব্যক্তিজীবনের নানান সমস্যা ভাবনা, ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গেই অনেকখানি নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে। ছেলেবেলাতে আমার প্রতি তুমি একটু বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে। কেন করতে, তা জানিনে। আপাততঃ আমি, সেটা তোমার একটি গুণ বলেই ধরে নিচ্ছি। কারণ, যে বয়সের কথা বলছি, তখন আমি মাস্টার হলেও, আজকের অধ্যাপক নয়। তখন ছিলাম ইস্কুল-মাস্টার। তুমি আমার সেই সময়ের ছাত্র। তখন তোমার কান, গণ্ড ও পৃষ্ঠ আমার দ্বারা নানানভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। নিয়মিত পড়াশুনোয় তোমার মত ফাঁকিবাজ জগতে দুর্লভ ছিল। ‘ক্লাসে একটা যা-হোক গোলমাল পাকিয়ে তুলতে তোমার জুড়ি ছিল না। এবম্বিধ ব্যাপারগুলোর নানান রকমফের তোমার সর্বত্রই চলত, সেজন্যে লাঞ্ছনার দুর্ভাগ্য তোমার ঘরে বাইরে সর্বত্রই ছিল। সৌভাগ্য এই, সেসব তোমার কাছে লাঞ্ছনা বলে গণ্য হতো না, হলে তুমি সেরকম দুরন্ত ছেলেটি থাকতে না।

আমার মনে হয়, তবু যে তুমি আমার প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে, যে কথাটা এখন তুমি প্রায়ই বলে থাক, ‘স্যার, আপনার চেহারা যেমন সুন্দর তেমনি রয়ে গেল, আপনার চোখের সামনে আমরা বুড়িয়ে গেলাম।’ এটি বোধহয় অন্যতম

একটি কারণ। তা ছাড়া, আমি যখন ইস্কুল-মাস্টার ছিলাম, তখন তোমরা আমার বাড়িতে অনেকে আসতে। নানানরকমের বই পড়াটা আমার নেশা ছিল। তোমরা এসে সেসব বই পড়তে। অভিভাবকদের কাছে সেসব আপত্তিকর বই। ইস্কুলে পড়ার বই ছাড়া, যে কোনো বই-ই তাঁদের কাছে আপত্তিকর। আমার মনোভাব সেরকম ছিল না। বিশেষ করে ইতিহাস ও নানান দেশবিদেশের কাহিনী ছিল আমার ঘর ভরতি। তোমরা এসে সেসব বই পড়লে আমি কখনো আপত্তি করিনি। সম্ভবত এই উদারতা ছিল আকর্ষণের আর-এক দিক। এবং তোমরা, যারা আমার ঘনিষ্ঠ ছিলে, তারা লক্ষ্য করেছিলে, ইস্কুলে আমি যেমন মাস্টারমশাই, বাড়িতে তা মোটেই ছিলাম না।

কিন্তু এসব কথার মধ্যে আমি ঠিক যেতে চাইনে। আমার নিজের সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলবার জন্যে ইদানিং কয়েক মাস ধরেই চিন্তা করছি। এবং আজকের এই বিরাট পাঁচালী পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ, আমিও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক হয়ে উঠলাম কি না, আর সঙ্গে সঙ্গে খুবই শংকিত হয়ে উঠছ, এই খাতা পড়ে তোমার মতামত প্রার্থনা করছি, বা বই ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

না, সেদিক থেকে তুমি আশ্বস্ত থাকতে পার। সাহিত্যিক হবার যোগ্যতা বা বাসনা, কোনোটাই আমার নেই। এবং তার মানেই এ নয় কী যে, তোমাকে আশ্বস্ত করা গেল! কারণ আমার জীবনের কিছু বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই এমন আনন্দদায়ক নয় যে, তোমার কাজ ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিরক্ত করতে হবে। তার জন্যে, মাত্র একটিই নিবেদন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যখন তোমার সময় এবং সুযোগ আসবে, তখন পড়ো। পড়তে পড়তে যদি বিরক্তি বোধ কর, তা হলে পড়ো না, (এবং এ বিষয়ে আমি এখনই প্রায় নিশ্চিত হচ্ছি যে, বিরক্তি বোধ তুমি করবেই, হয়তো রাগও হতে পারে।) তৎক্ষণাৎ এই পাঁচালীর পাঁজা নষ্ট করে ফেললেও আমি কিছু মনে করব না।

তবে একটাই আমার কথা, আমি রোজনামচার মত করে কিছু লিখিনি, যেটা অনেক বেশী মন্থর ও বিরক্তিকর হতে পারে। তা ছাড়া আমার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অনুমান করে নিতে পার। একান্তই রুটিনে বাঁধা। দিন এবং ঘণ্টাগুলো আমার কর্মক্ষেত্রের দেয়ালেই লটকানো থাকে। জীবন আমার ইচ্ছাধীন নয়। পৃথিবীতে কার বা কাদের জীবন নিজেদের ইচ্ছাধীন, আমি জানিনে। কাজের ব্যাপারে, ওই প্রফেসরস রুমের দেয়ালে লটকানো রুটিনের ইচ্ছাতেই আমার দিন যাপিত হয়। তা ছাড়াও টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে। সে সবও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাঁধা নিয়মেই চলে। অতএব, আমার প্রাত্যহিকতার, এদিক থেকে কোনো চার্ম-ই নেই। অবিশ্যি অন্যদিক থেকেও খুশি বা মুগ্ধ করবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, আমার কাছে এখন সমগ্র জীবনটাই একটা ছকের বন্দী, যাতনাদায়ক একঘেয়ে। অতি দুঃসহ, না এবং হ্যাঁ এর একটা প্রবল বিবাদ, যার পরিণতি একটাই। ওতে একটু কৌতূহল তোমার হতে পারে, যে কৌতূহলের সঙ্গে কিছু বিদ্রূপ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। একমাত্র এই কৌতূহলের টানেই যদি পাঁচালীটা পড়ে ফেলতে পার। এই আমার আশা।

যখন থেকে ভেবেছি, তোমাকে আমার জীবনের কিছু কথা বলি, তখনই একটা বিশেষ সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও তা কাটিয়ে ওঠা গেল না। সে জন্যেই কাগজ কলমের আশ্রয় নিতে হলো। সামনাসামনি বলার থেকে, এই নিঃশব্দ ও অনুপস্থিত থেকে বলার মধ্যে অনেক বেশী সচ্ছন্দ ও সহজ হতে পারব। দূরে বসে, আড়ালে থেকে, তোমার চোখ মুখের প্রতিক্রিয়াসমূহ কল্পনা করতে পারব, তবু সামনে বসে তো দেখতে হবে না। মুখে বলতে গেলে সেটাই হয়তো একটা মস্ত বাধা হয়ে উঠত। উঠতই, কারণ চিরদিনের জানাটা যদি সহসা অজানা হয়ে ওঠে, তা হলে মানুষ

চমকাবেই, আঘাতও পেতে পারে। তাই লিখেই পাঠালাম, এ ব্যবস্থায় তবু অনেক নিরাপদ বোধ করছি।

স্বভাবতই, তোমার পরবর্তী একটি প্রশ্ন থাকতে পারে। তোমাকেই কেন সব কিছু জানাবার জন্যে বেছে নিলাম। প্রথমতঃ তোমার সঙ্গে পরিচয়টা নিশ্চয় একেবারে সাধারণ পর্যায়ের নয়। ছেলেবেলার সেই দুষ্টু ছেলেটির প্রতি আমারও নিশ্চয় কিছু আকর্ষণ ছিল, যখন দেখতে পেয়েছিলাম, বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে সেই ছেলেটি একটি মূর্তিমান প্রতিবাদ হলেও, সে বাঁধা পড়ে আছে জীবনের নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে। কৌতূহল তার অপরিসীম। সে আমার ক্লাসের পড়া কোনোদিন বলতে পারত না বটে, দেশবিদেশের ও মানুষের জন্ম-বৃত্তান্তের তারিখ থেকে, অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে দিতে পারত।

অবিশ্যি এ কারণগুলোই সব নয়, বা মুখ্য নয়। তুমি যে সাহিত্যিক, একথাটাও ভুললে চলে না। সম্ভবতঃ এটাই প্রধান কারণ। দাঁড়াও, আবার একটা সংশয় বা সন্দেহ তোমার মনে দেখা দিতে পারে। আমার জীবনবৃত্তান্তকে তোমার গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে আমি দেখতে চাইছি কি না। সেজন্যে আগেই তোমাকে জানানো দরকার, কখনো ভুলেও আমার এসব বিষয় কোথাও কারুর কাছে ব্যক্ত করো না। এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার, নিজেকে গল্পের নায়ক করবার ছেলেমানুষি অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। আর এটা পড়লেই তুমি জানতে পারবে, নায়কোচিত কোনো গুণ বা জীবনে এমন কোনো ঘটনাই নেই, যার দ্বারা নায়ক হওয়া যায়। বরং এ একটা জীবনের নিতান্ত কলঙ্কজনক ব্যাধি ও বীভৎসতারই কাহিনী। এসব কোথাও প্রকাশ করা মানেই, যাকে বলে একজনের বিরুদ্ধে স্ক্যাণ্ডাল প্রচার করা। অতএব, বুঝতেই পারছ, ও ধরনের কোনো শস্তা ছেলেমানুষি ইচ্ছা আমার নেই। কারণ সমাজে, কর্মক্ষেত্রে ও নানান প্রতিষ্ঠানে আমি এখনো অক্ষুণ্ণ সম্মান নিয়ে বাস করছি। আমার নামে এসব প্রকাশ পেলে, বিধর্মীর কাছে, অন্য ধর্মীয়ের বিগ্রহ যেমন মুহূর্তের মধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়, আমিও

তেমনই হব। ঘৃণা এবং আক্রোশে যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়, আমার অবস্থাও সেইরকম হবে। চূর্ণবিচূর্ণ মানে, আমার পরিচিত জগত নিশ্চয় আমাকে দেহে আঘাত করবে না। মনে মনে তার চেয়েও বেশী কিছুই করবে।

তবু তোমাদের গুরুর ভাষায়, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা' এরকম একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়। যদি কখনো তোমার সেরকম মনে হয়, আমার কলঙ্ক থেকে তোমার কিছু গ্রহণের এবং আবিষ্কারের আছে, তা হলে সে অধিকার তোমার রইল। তবে আমাকে বাঁচিয়ে। সেখানে তুমি এমন কিছু নিশ্চয় করবে না, যার ভিতর দিয়ে আমার পরিচয়টা চাক্ষুষ হয়ে ফুটে উঠবে। আমাকে চেনা যাবে। তার পরিণতি কী হতে পারে, সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু তার প্রয়োজন কখনোই হবে না, আমি জানি। জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না সত্যি, অথচ সর্বাংশে পরিত্যাজ্য, এমন অনেক কিছুও আবার তেমনি আছে। যেমন ধর, যে কোনো কিছুরই গলিত ও পচা অংশ আমাদের ফেলেই দিতে হয়। আমার ধারণা, এও সেইরকমই। তোমরা যা কিছুই বল, অর্থাৎ লেখ, ধরেই নিচ্ছি, তার মধ্যে তোমার কিছু বলার থাকে। একটা কোনো বক্তব্য উপস্থিত করার দায়িত্ব তোমরা এড়িয়ে যেতে পার না।

কিন্তু আমার সমগ্র জীবনে বক্তব্য বলার মত কিছুই তুমি পাবে না। নিয়তির নির্দেশে, অন্ধের মত যাদের নিষ্ঠুর মর্মন্তুদ পথে চলতে হয়েছে, সে রকম অনেক জীবনই তোমাদের উপজীব্য হতে পারে। যেমন ধরা যাক, ম্যাকবেথ। কিংবা তোমাদের আধুনিক সাহিত্যেরও অনেক চরিত্রের মধ্যে তা দেখা গিয়েছে। যেমন ধর দস্তয়ভ্স্কি বা লরেন্স বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংবা এমন কি হালের আলবেয়ার কামু, এঁদের অনেকের রচনার মধ্যেই, নিয়তি পরিচালিত, পুতুলনাচের দুঃসহ জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সেই ব্যক্ত হওয়ার মধ্যে, তাঁদের সকলেরই কিছু বক্তব্য বলার ছিল। সোজাসুজি একটা সমাজব্যবস্থার মাঝখানে ফেলে, মানুষকে সেই আলোকে দেখে, সেই

সমাজের সমালোচনা ও পরিবর্তন করতে চাওয়া অনেকটা সহজ। অর্থাৎ এই একজিস্টিং সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করার এই পদ্ধতিটা মোটামুটি সরল ব্যাপার। কিন্তু যখন ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়, এই সমাজ মানে আমিও, এবং আমার সঙ্গেও নিজের একটা সংগ্রাম ও সংঘর্ষ জীবনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে, ব্যাপারটা তখনই হয়ে ওঠে জটিল।

সোজাসুজি কোনো কারণে কাউকে দায়ী করতে পারলে, আমরা খুব খুশি। কিন্তু সেই দায়ী করাটা যখন নিজের ওপর এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা কী ভীষণ অসহায়, একবার চিন্তা করে দেখ। তখন নিজের সঙ্গে নিজেকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়, এবং আমার বিশ্বাস, নিজের সঙ্গে সংগ্রাম যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, এই একজিস্টিং সমাজের সঙ্গে সংগ্রামটাও ততোধিক তীব্র হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে, নিয়তি সম্ভবতঃ মানুষের নিজের ভিতরেরই অপরিচিত জগত, যার অঙ্গুলিসংকেতের অসহায় পথে তাকে চলতে হচ্ছে।

কথাগুলো লিখতে একটু কুণ্ঠা বোধ করছি। তুমি যেন মনে করো না, কথাগুলো তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি। হয়তো অনেকের পক্ষেই আমার এ সব কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এগুলো আমার মোটামুটি বিশ্বাস।

পৃথিবীতে এতকাল ধরে বলে আসা হয়েছে, মানুষের মনের জগতই সব থেকে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু আমি তোমাকে যে সব সাহিত্যরথীদের কথা বলছি, তাঁদের কথা পড়লে মনে হয়, আধুনিক মানুষ সেই দুর্জ্ঞেয় জগতের সন্ধানে তেমন একটা পেছিয়ে নেই আর। সেই জন্যেই আপন অসহায়তাকে সে আজ বেশী করে খুঁজতে শুরু করেছে, কারণ সে এটা বুঝতে পেরেছে, ভূতের বাস সর্ষের মধ্যেই। যাকে বলে সর্বমানবের কল্যাণ, আমার ধারণা, এর মধ্যেই তার বীজ নিহিত রয়েছে। কথাটা তোমার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেল কি না বুঝতে পারছি না। শত হলেও মাস্টার তো, অভ্যাসটাই এমন হয়েছে যে সবকিছু ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে

পারলাম কি না, এ সংশয়টা ঘুচতে চায় না। যেমন ধর, কার্লমার্কস্‌। সমস্ত জীবন ধরে তিনি একটি দর্শনকে খুঁজে বের করেছেন, অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী জটিল, বহু চিন্তাজালের ভিতর দিয়ে, কেন এবং কেন না, এই দুঃসহ কাটাকাটির মধ্য দিয়ে, একটা জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন, যেটা কিনা আবার এমনিই ব্যাপার, বিশ্বপ্রকৃতির দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য বলে তিনি দাবী করেছেন। সেটা কিন্তু আমার বিচার্য নয়। আমাকে তুলনার কথাটা এই জন্যেই আনতে হলো, যে একজিস্টিং সমাজে বসে, তিনি নতুন ভবিষ্যতের কথা বলেছেন, তার জন্যে, তাঁকে নিজের সঙ্গেও একটা ভাইটাল লড়াই নিশ্চয় করতে হয়েছে। কারণ যা তিনি সমর্থন করতে পারবেন না, গ্রহণ করতে পারবেন না, নিশ্চয় সেরকম কোনো কিছু আবিষ্কারের পিছনে সারাটা জীবন নিয়োজিত করতেন না। কিন্তু এ কথা কি বিশ্বাস করে নিতে হবে, ধনতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার এবং বৈশিষ্ট্যগুলো সবই তিনি নিজের ভিতর থেকে আগেই ত্যাগ করে, মনে প্রাণে একজন সাম্যবাদী হয়ে, তারপরে ক্যাপিটাল লিখতে বসেছিলেন? আমার মনে হয়, তা নয়। নিজের ভিতরের অসহায়তার সঙ্গে যুঝতে গিয়েই, তাঁকে এই আবিষ্কারের পথে আসতে হয়েছিল, এবং নিজের সঙ্গে সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছিল, ততই বাইরের সঙ্গেও। কারণ প্রথমে তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল, এই সমাজ এবং আমি রাজী আছি কি না পরিবর্তনের। আমি চাই কি না। এই জিজ্ঞাসাই তাঁর বর্তমানকে ভিতরে ভিতরে বাতিল করেছে, নতুনকে আশ্রয় করেছে। নিজেকে চেনার সাহস ছিল বলেই, সাম্যবাদে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। সেটাই তাঁর নিয়তি, তাঁর ভিতরের অস্তিত্ব, যার নির্দেশে তিনি চালিত। কিন্তু এই 'নিয়তি' কথাটা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হবে। তা হোক, তাতে মার্কস বা তাঁর কাজকে ছোট করা হচ্ছে না।

কিন্তু এসব আমাদের আলোচ্য নয়, আর ঠিকমত তোমাকে

আমার কথা বোঝাতে পারলাম কি না, তাও জানিনে। বলতে চেয়েছিলাম, সাহিত্যের উপজীব্য এবং বক্তব্য, যা আমার জীবনবৃত্তান্তের কোনো কিছু দিয়েই তোমার মিটবে না। কেননা, আমার নিয়তিনির্দেশিত অসহায় জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো বক্তব্যই (সাহিত্যের বক্তব্যের কথা বলছি।) উদ্ভাবিত হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, অন্ততঃ তোমার সাহিত্যের ধোপে টিকবে না।

তবে, তবু তোমাকে কেন বলতে চাইছি আমার কথা! বলতে চাইছি এই কারণে, জীবনে তো অনেক কিছুই দেখলে শুনলে, দেখে শুনে, বিস্মিত ক্ষুব্ধ খুশি, অনেক কিছুই হয়েছ, আমার কথাটাও না হয় শুনলে। যে মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে কাছে থেকে দেখে এসেছ, যে মানুষকে তার একটা পরিচয়ে চেন, এবং তার সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করে এসেছ, সে যে কতখানি অচেনা অপরিচিত, সেটা একটু জান। তোমার জানার সঙ্গে, সাধারণের জানার তফাত এইটুকু থাকবে, তোমার বিচার হবে সহৃদয়, কিন্তু দুয়ে আর দুয়ে চারের মত, সরলীকরণের দ্বারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে না।

তুমি তো বিচিত্রের সন্ধানী। অনেক বিচিত্র মানুষ তুমি দেখেছ, জগতের অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছ। তার ভিতরে ডুব দিয়ে, অনেক কিছু বের করতে চেয়েছ। শব ব্যবচ্ছেদের মত, মানুষের মনকে চিরে চিরে, নানানভাবে বিচার করে দেখেছ। তেমনি আমাকেও একটু দেখ, আমার জীবনটাই বা কেন এমন হলো, আমার নিয়তি কেন আমাকে এই পথেই ঠেলে দিল। আমাকে এক কথায় নাকচ করে দেওয়া যায়, অর্থাৎ আমার কথা শোনবার কোনো প্রয়োজনই তুমি বোধ না করতে পার, কারণ ব্যাপারটা একদিক থেকে এতই সাধারণ। এতই সাধারণ যে, হঠাৎ শুনলে তোমার মনে হবে এরকম মানুষ জীবনে তুমি অনেক দেখেছ, নতুন করে কিছুই জানার নেই।

কিন্তু না, সে ভাবে তুমি ব্যাপারটাকে দেখবে না বলেই আমার বিশ্বাস। 'সহিত' শব্দ থেকেই যদি 'সাহিত্য' শব্দের উৎপত্তি হয়ে

থাকে, তাহলে সহিতত্বের একটা মূল্য তোমাকে দিতে হবে। নতুন করে কিছু জানার না থাকতে পাবে, তবু একটা অনুভূতির প্রশ্ন থেকে যাবে। কারণ উপযাচক হয়ে তোমাব কাছে যে এ ভাবে নিজেকে ব্যক্ত কবতে বসেছি, আমাব দুঃসহ অসহায়তার কথা যে তোমাকে অকপটে বলতে বসেছি, তাব একটা মূল্য কি তুমি দেবে না।

জানি, শেষ পর্যন্ত তোমাকে হয়তো করুণা কবে একটু হাসতে হবে, তবু সেখানেই যদি তোমার অভিব্যক্তি শেষ হয়, কিছু বলার নেই। তবু আমি কিন্তু তোমার কাছে জানতে চাইব, অনেক মানুষকে তো অনেক রকমেই দেখেছ, ভেবেছ, বিচার করেছ, আমাকে কেমন দেখলে।

যদিচ, তোমাকে আগেই বলেছি, একটি যাতনাদায়ক অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই তুমি আমাব বৃত্তান্ত থেকে পাবে না, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা মোটেই নতুন কিছু ঠেকবে না। যেমন ধব, আমি আজ যখন তোমাকে প্রথম লিখতে বসেছি, এখন, এই মুহূর্তের কথা বলছি, এখন বাত্রি অনেক।

না, বাত্রি অনেক বললে ভুল হয়, বাত্রের আর বিশেষ বাকী নেই। দুটো বেজে গিয়েছে, প্রভাতের দিকেই রাত্রেব গতি, যেখানে গিয়ে সে তার অন্ধকাব মুখ সরিয়ে নেবে। রাত্রি দুটো বেজে গিয়েছে, কলকাতা নিদ্রিত। যদিচ কলকাতা কখনোই অঘোরে ঘুমোয় না, বড় বাস্তার বুকে, প্রায়ই এক একটা ভারী মোটর লরীর শব্দ শোনা যাচ্ছে, হয়তো ভাবতবর্ষের অন্য কোনো প্রান্তে তারা চলেছে। আমি এখন বসে তোমাকে লিখছি। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে সব কথা লিখব। ভেবেছিলাম, টিউটোরিয়াল শেষ কবে বাড়িতে বসে লিখতে শুরু কবব।

কিন্তু তা পারিনি। আমি যার ঘরে বসে লিখছি, যে মেয়েটির ঘরে বসে লিখছি, সে প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়েই আমার পাশে শায়িতা। কিছু একটা নাম হয়তো সে আমাকে বলেছিল প্রথম রাত্রে, কিন্তু আমি এখন আর তা স্মরণ করতে পারছি না। ধরেই নিতে হয়,

একে আমি চিনি না। মেঝের মোটা গদীওয়ালা বিছানায় আমি বসে লিখছি। মেয়েটি পাশেই একেবারে নিদ্রিত। এ ঠিক অঘোরে ঘুম বললে ভুল হবে, কারণ কাছেই, শেষ চুমুক দেবার অবসর না পাওয়া, অবশিষ্ট পড়ে থাকা মদের পাত্র এবং বোতলই প্রমাণ করছে, মেয়েটি নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে। তোমার পক্ষে অনুমান করতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না যে, মেয়েটি বেশ্যা, এবং আমি তার ঘরে। কর্পোরেশনের গাড়ি বা ট্রামের প্রথম ঘর্ঘরানি আমার কানে এলেই আমি এখান থেকে উঠব, বাড়ি যাব। স্নান করে ঘুমোব, তারপরে যথাপূর্বং আমার কাজে যাব, যা রুটিনে বাঁধা আছে।

আমি জানি, ইতিমধ্যেই বিস্ময়ে প্রায় তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার চোখের সামনে আমার চেহারাটা ভেসে উঠছে। যে মূর্তি দেখতে ছেলেবেলায় তোমার খুব ভাল লাগত, এবং সেই সঙ্গেই আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতবাড়ি, আমাদের বংশের ঐতিহ্য, আমার এতদিনের পরিচয়, শিক্ষা দীক্ষা সুনাম, সবই তোমার মনে পড়ছে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পর্যন্ত তোমার কষ্ট হচ্ছে, হয়তো বিশ্বাসই করতে পারছ না। আমার মাথা খারাপ হয়েছে কি না, তাই ভাবছ। হয়তো, তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আমার মায়ের মুখ, দিদির মুখ, যাঁদের তুমি ছেলেবেলায় দেখেছ, এখন যাঁরা কেউই আর নেই। কোনো কিছু দিয়েই আমার এই বর্তমান পরিবেশ, অবস্থান, মেলাতে পারছ না।

কিন্তু তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আমি অবিশ্যি মদে তেমন আসক্ত নই, তেমন কেন, ও বস্তুতে আমার কোনো আসক্তি নেই বললেই চলে। তাই, এই মেয়েটির মত, অঘোরে অচৈতন্য হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হলে আমি তাই থাকতাম। কারণ, আমি জানি, এই রকম থাকতে পা...বার মধ্যেই তবু খানিকটা শান্তি আছে। কিন্তু আমি তা থাকতে পারি না, মদ আমি বেশী খেতে পারি না। না খেতে হলেই ভা... উৎপন্ন। তবে,

সবকিছুরই যেমন একটা প্রস্তুতি থাকে, যেমন খর রৌদ্রের তেজ সইবার জন্যে চোখে একটা কালো ঠুলি লাগিয়ে নিলে সুবিধে হয়, অনেকটা সেইরকমের। অপ্রতিরোধ্য টানে এখানে যখন চলে আসতেই হয়, তখন শেষ আড়ষ্টতার বেড়িটা থাকে কেন। অবিশ্যি কথাটা তোমার কাছে একটু আশ্চর্যজনক বোধ হতে পারে, যদি 'অপ্রতিরোধ্য' টানেই আসি, তবে 'আড়ষ্টতার বেড়ি' এখনো কোথায় জড়িয়ে আছে। সেটা তোমার কাছেই কেবল আশ্চর্যজনক নয়, আমি নিজে এখনো এই আশ্চর্যের হাত থেকে রেহাই পাইনি। কারণ, এমনকি ব্যাপারটা আমার জীবনে নতুন তো নয়ই, অনেক পুরনো। তবু শেষ মুহূর্তে এসে, যেমন প্রচুর পেট্রল থাকা সত্ত্বেও সামান্য মবিলের জন্যে এঞ্জিন গোলমাল করে বসে, এর বেলাও তেমনি। তখনই দরকার হয়, খানিকটা ডেস্‌পারেট বা ডেলিবারেট হয়ে ওঠার, দু'এক পেগ মদে যেটা সাহায্য করে।

কিন্তু এখন তার কোনো ঘোরই আমার মধ্যে আর নেই। আমি যে শুধু তোমাকে আমার কথা লিখতে বসেছি, তা নয়। আমার ব্যাগের মধ্যে, এখনো প্রিয়তোষের, (প্রিয়তোষ চ্যাটার্জিকে নিশ্চয়ই চেনো। খুবই উৎসাহী আর মেধাবী ছেলে, তোমাদের মত না হলেও সে আমার অন্যতম প্রিয় ছাত্র।) রিসার্চের খাতাপত্র সব রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওগুলো সাবমিট করতে হবে। তার আগে একবার আমাকে দেখতে দিয়েছে। কিছুটা দেখেছি, যা দেখেছি, তাতেই নিশ্চয় করে বলা যায়, ডক্টরেট ও নিশ্চয়ই পাবে। বাকীটা আজই দেখে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু, আমার নিজেকে নিয়ে আমি এমনই একটা অবস্থায় এসে পড়েছি, নিজের কথা না লিখতে বসে পারলাম না। প্রিয়তোষ আমার কাছেই কাজ করে, আমিই ওর হেড অব্‌ দি ডিপার্টমেন্ট। যদি আমার বিষয় নিয়ে এতটা ব্যস্ত হয়ে না পড়তাম, তাহলে, এই পরিবেশে এখন আমি রিসার্চের খাতা দেখতাম। অপরের মুখ থেকে শুনলে একথা বিশ্বাস করতে পারতে না। আমার পরিবেশ ও জগতের

সামনে কেউ এসব কথা বললেও সহসা বিশ্বাস করে উঠতে পারবে না।

অথচ ব্যাপারটা তাই। একটি নগ্ন মাতাল পণ্যাঙ্গনা তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে, আমি তার পাশে বসেই তোমাকে জানাবার জন্যে নিজের কথা লিখছি। তা ছাড়া আমি সময় পাব না। শুধু সময় কেন, মন বলেও একটা পদার্থ আছে। তার পক্ষেও এ-ই বৃত্তান্ত বিবৃত করার এই প্রশস্ত সময় ও স্থান। তার পরেই তো আর-এক জগতে চলে যাব। তখন আমাকে এসব চিন্তা এত বেশী বিচলিত করে না। যে কারণে আমি দিনের মত রাত্রেও কাজে ডুবে থাকতে চেয়েছি, যাতে এই পরিবেশে আমাকে আসতে না নয়। কিন্তু তোমাকে আগেই আমি একটি অপ্রতিরোধ্য টানের কথা বলেছি।

কিন্তু এই একটি রাতের বিবরণ আমি তোমাকে লিখতে বসিনি। এটি একটি সূত্র মাত্র। তোমাকে আমি যা বলতে চাই, তার প্রথম প্রস্তাবনা হিসাবে, আমি এই ঘরের কথা, এই সময়ের যে সব আচার আচরণের জন্য মানুষেরা এখানে আসে, আমিও তার জন্যেই এসেছি, এবং এই মেয়েটির সঙ্গে সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই আমি বাস করেছি। হয়তো ইতিপূর্বেও কখনো এর কাছে এসেছি বা আসিনি, সেটা আমার বিচার্য নয়। মনেও নেই। কিন্তু কেন এসেছি, সেটাই বলতে চাই। যদিচ আমি আজও সত্যি জানি না, কেন এসেছি।

মাসখানেক আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে, 'স্যার, আপনি বিয়েটা আজও করলেন না।'

তোমাকে হেসে বলেছিলাম, 'সময় পেলাম না।'

দেখেছিলাম, তোমার চোখে একটি অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার কথাগুলোও কিন্তু আমি পড়তে পেরেছিলাম তোমার চোখে। তুমি একটি প্রেমঘটিত ট্র্যাজেডির সন্ধান করেছিলে আমার মধ্যে। আমার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে, প্রায় সমগ্র মেয়ে ও

মহিলা কুলের ছবি ভেসে উঠেছিল তোমার চোখের ওপর। অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলে, কে সেই মহিলাটি, যিনি তোমার এই মাঝবয়সী সুদর্শন রুচিবান স্যারটিকে ঘা মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে। কার হাতে সেই চাবিকাঠি, যে কুলুপ এঁটে ভেগেছে।

তোমার বোধহয়, আমাদের পাশের বাড়ির, হেডপণ্ডিতের মেয়ে প্রিয়ংবদার কথা মনে হয়েছিল একবার। তোমরা যখন খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে আসতে, প্রায়ই ওই মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে দেখতে পেতে। আমাদের বাড়িতেই শুধু নয় পাড়ার অনেক জায়গাতেই, আমার ঘরেও। তোমাদের তখন এ্যাডোলেসেন্স। প্রিয়ংবদার চেহারাটিও ছিল সুন্দর। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী, একপিঠ চুলওয়ালা, ছটফটে মেয়ে। তোমাদের চোখে ওকে ভাল তো নিশ্চয়ই লাগত। পরবর্তীকালে আরো এই ভেবে ভাল লাগত, স্যার-এর সঙ্গে নিশ্চয় মেয়েটার 'প্রেম' আছে। বিশেষ করে, আমি আবার ওকে 'প্রিয়ে' বলে ডাকতাম, ও আমাকে জিভ ভেংচে চোখ পাকিয়ে বহুবিধ রকমের শাসন করত, ঠাট্টা ইয়ারকি করত। তোমরা দেখতে, ও ছিল আমার মায়ের ও দিদির খুবই প্রিয়পাত্রী।

কিন্তু বিশ্বাস করতে পার, প্রেমের দেবতা কখনোই আমার বুকে তাঁর শরটি নিক্ষেপ করেননি। জানিনে, প্রিয়ংবদার প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন কি না, কিন্তু আমার প্রতি ওই দেবতাটি চিরকালই বিরূপ। অন্যথায়, আজ এটুকু বোঝবার বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে চেনা শোনা, আমার প্রতিটি প্রয়োজন অপ্রয়োজন বোঝে, আমার নাড়ীনক্ষত্র জানে, চুখ্‌চেটে, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সহৃদয়, এমন প্রিয়ংবদার সঙ্গেই আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, এবং আমার মত যে কোনো লোকই তাতে সুখী হতে পারত। হয়তো, আমার মা দিদির, প্রিয়ংবদাদের বাড়ির, এমন কি প্রিয়ংবদারও সে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো সাড়াই ছিল না। কারণ আমি কিছুই অনুভব করতাম না। সত্যি বলতে কি, আজও করি না।

আমি জানি, প্রিয়ংবদার যখন বিয়ে হয়ে গেল, তখন তোমরা মনে মনে খুব একচোট শরৎ চাটুয্যের গল্প ঝালিয়ে নিয়েছিলে। ভেবেছিলে, একটা বিরাট ট্র্যাজেডি ঘটে গেল। প্রিয়ংবদাও একটু অবাক হয়েছিল নিশ্চয়। এখন প্রিয়ংবদা যখন বাপের বাড়ি আসে, ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বড় ছেলেটি আর মেয়েটি কলেজে পড়ে। প্রিয়ংবদা নিজেও বেশ ভারিক্কী গিন্নি হয়েছে। আমাকে এসে এখনো ধমকায়। একটা বিয়ে কেন করছি না, করতে হবে, এই বলে শাসায়। এমনকি, আবিষ্কার করতে চায়, কার পথ চেয়ে আমি জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে, এখনো, সে কে, যার কথা ভেবে জীবনের একটা দিক চির অন্ধকারে লুকিয়ে রাখলাম।

একথা কি কাউকে বলা যাবে, আমার সব পথ, সব অন্ধকার, এই বারোবাসরে এসে থেমেছে, পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আমি কি একথা কাউকে বোঝাতে পারব, নিয়তির অমোঘ নির্দেশে অসহায় দুচোখ মেলে, আমিও ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি, এখানে কেন, আমি এখানে কেন? স্ত্রী-পুত্র-পরিবারহীন আমি, বারবধূর এই নগ্নদেহের পাশে এসে ঠাঁই নিয়েছি কেমন করে?

না, তোমার কল্পনা বিস্তার করে কোনো লাভ নেই। আমার সঙ্গে মেলামেশা আছে, আমার কাছে যাতায়াত আছে, এমন কোনো মেয়ে বা মহিলাকে নিয়ে তুমি ট্র্যাজেডির সন্ধান করলে ভুল করবে। সেদিন তাই করেছিলে। তারপর বলেছিলে, 'সময়ের কথাটা স্যার মেনে নিতে পারছিনে। সংসারে বিয়ে করবার 'সময়' আবার একটা সময় নাকি। এত লোকে সময় পায়!'

তখন তোমাকে আমি বলেছিলাম, 'মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ বোধ করি না।

'কখনো কি করেননি?'

'বিশ্বাস করতে পার, কখনো করিনি। যদি বোধ করতাম, তা হলে নিশ্চয়ই বিয়ে করতাম।'

তুমি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলে, বিশ্বাস করবে কিনা, বুঝতে পারছিলে না। এমন কি, আমি জানি, তোমার চোখে একটি সংশয় ফুটে উঠেছিল, দৈহিক দিক থেকে আমার কোনো গোলমাল আছে কিনা। প্রকৃতির প্রহারে বা অন্য কোনোভাবে জন্মসূত্রেই আমি পুরুষত্ব হারিয়ে বসে আছি কিনা। তোমার চোখের সেই সংশয় দেখে, না বলে পারিনি, 'দেখো সাহিত্যিক, একটা কিছু ভুল ভেবে বসো না যেন। তবে, ভাগ্য তোমরা মানো কিনা জানিনে, এটা জেনে রেখো, সকলের ভাগ্যে সবকিছু ঘটে উঠে না। পৃথিবীতে যারা কখনো বিয়ে করেনি, তাদের সকলেরই যে দেহঘটিত অযোগ্যতা ছিল বা তারা সকলেই না ভেবেচিন্তে অবিবাহিত জীবনযাপন করবে বলেই স্থির করে রেখেছিল, তা নয়। এমন মানুষ অনেক আছে, সব থাকতেও তাদের সবকিছু ঘটে উঠে না। আমার ব্যাপারটা সেই রকম।'

তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, 'আপনার কি স্যার এখনো ইচ্ছে হয়?'

'না। কোনো দিনই বিয়ে করে সংসার-জীবন যাপনের ইচ্ছে আমার হয়নি, আজও হয় না। তবে কেন হয়নি বা হয় না, এ প্রশ্নটা আমিও নিজেকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। কোনো জবাব নিজের কাছে পাই না।'

তুমি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলে। এটা ঠিক, তখনি তোমাকে মন খুলে সব কথা বলতে পারিনি। তাই তুমি বলেছিলে, 'অদ্ভুত ব্যাপার স্যার। আমি এরকম কিন্তু কখনো দেখিনি। এখন মোটামুটি আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে কোনো বাধা নেই। সব কিছুর পিছনেই প্রায় একটা কারণ থাকে। আপনার ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।'

আমি বলেছিলাম, 'বুঝতে আমিও ঠিক পারি না।'

'আপনার কষ্ট হয় না?'

'হয়তো হয়, কিন্তু তার স্বরূপটা আমি তোমাকে ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

অর্থাৎ যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারতাম, সে কথা তখন তোমাকে

ব্যক্ত করার উপায় ছিল না আমার পক্ষে। সেদিন আর একবার ভেবেছিলাম, তোমাকে আমার বৃত্তান্ত আমি জানাব। কষ্ট নিশ্চয়ই আছে, এবং তা দুর্বিষহ। অথচ এ কষ্টের কার্যকারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। যে কারণে বারেবারেই আমি নিয়তির কথা বলছি, অসহায়তার কথা বলছি।

তুমি কী ভেবেছিলে, আমি জানি না। তবে মনের মধ্যে কোথায় তোমার একটু খচ খচ্ করছিল। সেটাই স্বাভাবিক। আমার প্রতি তোমার যা মনোভাব, তাতে খচ খচ্ করাটাই স্বাভাবিক। তুমি সে বিষয়ে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করনি। আমি তখন থেকেই স্থির করেছিলাম, তোমাকে আমার বৃত্তান্ত বলা দরকার।

আমি জানি, এখানে আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে, আমার আপন বলতে কেউ নেই বলে, বিয়ে করা ঘটে উঠল না। যে কারণে, মায়ের মৃত্যুর পরে, দিদি এবং দিদির মৃত্যুর পরে অন্যান্যেরা অনেক চেষ্টা করেছেন আমার বিয়ে দেবার। কিন্তু একমাত্র আমিই জানতাম, এ জীবনে আর তা সম্ভব নয়। এক একটা জীবনের পথের মোড়, শুরুতেই এমন ঘুরে যায় এবং ছুটতে থাকে, তখন ওকে আর কোনোরকমেই ফিরিয়ে আনা যায় না। তখন তাকে আর ঘুরিয়ে নিয়ে এসে নতুন করে অন্য পথে চালানো যায় না।

এই যে এখন যেখানে বসে তোমাকে এসব লিখছি, আমি জানি না, এখানেই আবার ফিরে না আসার কী উপায় আমি অবলম্বন করতে পারি। কিন্তু এভাবে তোমাকে আমি সব কথা বলতে পারব না। আমাকে শুরু থেকেই সব কথা বলতে হবে। আমার জীবনের আর-এক দিকের শুরু, এক অন্তহীন সীমাহীন অন্ধকারের শুরু কী ভাবে তার প্রথম দরজা খুলে দিয়েছিল, আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছিল।

তা ছাড়া, আমি ঠিক কী বলতে চাইছি, আমার জীবন-বৃত্তান্তের সেটা কতখানি, আজকের এই পত্রের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এবং

তাৎপর্য, একেবারে প্রথম থেকে শুরু না করলে বলতে পারব না। তা ছাড়া এখানে আমার সময়ের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। এবার আমি বাড়ি ফিরব ঘুমোতে। অবিশ্যি এর থেকে যেন ধরে নিও না, আমি আবার আগামী কালই এখানে আসব; এখানে বলতে এই ঘুমন্ত দেহজীবিনীটির কথাই বিশেষ করে বলছি না। এখানে বলতে আমি বেশ্যালয়ের কথাই বলছি। এমন কোনো কথা নেই যে, যাব না। যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। আমি এখন কিছুই বলতে পারি না। আমি জানি না, নিজের গৃহে রাত্রি যাপনের সৌভাগ্য আমার কবে আছে, কবে নেই। যদি বাড়িতে থাকি, তবে সেখানে বসেই আবার লিখব, কিংবা যেখানেই থাকি।

না, সে সৌভাগ্য আমার আজ হয়নি। গতকাল লিখেছিলাম, আজকের কোনো কথা আমি জানি না। আজ সন্ধ্যার পরে, সব কাজের শেষে, বাড়ি ফিরে আহার সেরে, একটু বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, আমাকে যে অপদেবতা যৌবরাজ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে, তার নিজের শর দিয়ে আঘাত করে রক্তের মধ্যে বিদ্ধ করে সম্মোহিত করেছিল, আমাকে সে ঠিক সেখানেই টেনে নিয়ে এসেছে আবার। বাড়িতে দূর সম্পর্কের এক বৃদ্ধা বিধবা থাকেন। আসলে থাকে অমর্ত, অমৃত যার ভাল নাম, আমাদের বাড়ির পুরনো চাকর। আমার থেকে এখন তার বয়স অনেক বেশী, কিন্তু যথেষ্ট শক্তসমর্থ আছে। এই অমর্তই সম্ভবতঃ আমার জীবনের কিছুটা বোঝে, আমার গতিবিধির কিছু দিকনির্ণয় মনে মনে করতে পারে। আমার চারপাশের জগত যে কোনোদিনই আমাকে গভীর রাত্রে বা শেষ রাত্রে ফিরতে দেখেনি, তার কারণ অমর্ত সজাগ থেকে, এক মুহূর্তেই এসে দরজা খুলে দেয়। আজকালকার সব বাড়ির খবরই ঝি চাকরেরা বাইরে চালান করে। অমর্ত সেদিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। এ বাড়ি এখন ওর নিজের বাড়ি।

আমার কলঙ্ক এখন ওর নিজের কলঙ্ক বলে গণ্য করে। তাই বাইরে কোনো কথাই সে কখনো প্রকাশ করবে না। বরং রাত্রিবেলা যদি হঠাৎ বেরোবার উদ্যোগ করি, ও তা যেন সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারে। সে যে কোথায়, কোন অন্ধকার ঘুপচি থেকে আমাকে লক্ষ্য করে টের পাই না। এমন কি আজকাল সে আমার সামনে চলে আসে, বলে, 'বেরুবার মন করছ নাকি?'

অমর্তর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করা সম্ভব নয়, অন্যথায় তার এটা অনধিকারচর্চা ভেবে রাগ করতাম। কিন্তু গৃহের যা কিছু সবই তো অমর্তের হাতে। সে হাতের সামনে সব গুছিয়ে না দিলে, সে আমার সবকিছুর ব্যবস্থা না করলে কে করবে! কোনোদিনই ওর সঙ্গে আমার পষ্টাপষ্টি কোনো কথা হয়নি। এই যে অস্পষ্টতা, আমি জানি, বলা-কওয়ার স্পষ্টতার চেয়ে অনেক স্পষ্ট, স্বচ্ছ। আমি যে কোথায় যেতে চাই বা যাব, সে নিশ্চয়ই বোঝে। তাই আজকাল আমি জবাব দিই, 'হ্যাঁ, একটু বেরুব।'

অমনি সে নিজে থেকেই পাট করা ধোয়া ধুতি বের করে কুচিয়ে দেয়। ধোয়া জামা বের করে দেয়। হাতের কাছে টুকটাক জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়। এমন কি, লাস্ট টাচ্, আতর বা সেন্টের শিশিটাও এগিয়ে দিতে ভোলে না। তবে আজকাল সে একটি কথা প্রায়ই বলে, 'বেশী রাত করো না, আবার তো সকাল হলেই তোমার কাজ। একটু ঘুমোতে পাও না, শরীর খারাপ হবে।'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়েই আমি বেরিয়ে পড়ি।

আজও সেইভাবেই এসেছি। এখন রাত্রি একটা বেজেছে। সংক্ষিপ্তবাশ একটি মেয়ে, সে ঘুমোয়নি। আমার দিকেই তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। দেখছে, আমি কী করছি, আমি কী লিখছি। মেয়েটি মত্তপ নয়, শুনছিলাম, কাছেই কোথায় নিজের সংসার পরিজন রয়েছে। সেখানে ওর সন্তান রয়েছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি বিবাহিতা?'

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল,

'আপনি বিবাহিত নন?'

অর্থাৎ, ওর বলার বিষয় ছিল, বিবাহে কী যায় আসে। আমার মত প্রৌঢ় বয়সের লোক নিশ্চয় বিবাহিত; তবু কেন এখানে ছুটে এসেছি?

আমি বলেছিলাম, 'না, বিয়ে করলে আর এখানে আসব কেন?'

অবিশ্বাসে মেয়েটির ঠোঁটের ও চোখের কোণ কুঁচকে উঠেছিল। বলেছিল, 'তাই নাকি, আজও বিয়ে করেননি?'

বলে হেসে উঠেছিল। আবার বলেছিল, 'খুব দুঃখের কথা তো? জোটেনি বুঝি?'

জানি, আমার বয়সের একজন লোকের পক্ষে, অবিবাহিত বলে বোঝানো কঠিন। যার মাথার সামনে এখন ঘাসহীন মসৃণ সৈকতভূমির মত টাক, কানের ও ঘাড়ের চারপাশের চুল শাদা-কালোয় ধূসর হয়ে উঠেছে, জীবনের শেষদিনের ছায়া যার কপালে চোখের কোলে ইতিমধ্যেই তার আগমনবার্তার রেখা এঁকেছে, তার পক্ষে এখানে নিজেকে অবিবাহিত বললে, বিশ্বাস করতে চাইবে না। যদি বিশ্বাসও করে, তবে সেখানে সম্মান পাবার আশা কম। এটা এক বিচিত্র ব্যাপার। যে মানুষ না পেয়ে এখানে এসেছে, ধরেই নেওয়া হয়, যার জোটেনি, তাদের বড় একটা খাতির নেই এই বারবধূদের কাছে। দেখছি, বিশ্বের নারীজগতের টানটা একদিকেই, যে অনেক পেয়েছে, তাকেই সবাই পেতে চায়। বেশ্যাদের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, বিবাহিত পুরুষকে বশ করার মধ্যে কোথায় যেন ওদের একটা সান্ত্বনা আছে, একটা তৃপ্তি আছে। অবিবাহিত ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে ওদের তেমন মিশ খায় না। কে জানে, হয়তো ওদের তত্ত্বে বলে, অবিবাহিত ছেলে-ছোকরারা অস্থির অশান্ত, যৌবনের দিকভ্রান্ত বেপথুমানতায় চলে এসেছে। এরা ঘুরে আসবার পাত্র নয়। একটি বিয়ে হলেই সব শান্ত। তাই হয়তো, তাদের সঙ্গে এদের তেমন মেলে না। যদি এটাও ধরে নিতে হয়, প্রগলভ ও বেহিসেবী যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করার জন্যে,

বেআবরু তরুণ যৌবনের দরকার, তাহলে সেটা এখানে নয়। কারণ এতদিনে এ কথাটা বুঝতে পেরেছি, এখানে যারা আসে, তাদের মনে যত উন্মাদনাই থাকুক, যাদের কাছে আসে, তাদের দেহের দেউলে, যৌবনের বিগ্রহ প্রকৃতিদেবী চির অন্ধকারেই থেকে যায়, সে কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। যদি ওঠে, তা কদাচিৎ। কারণ সে দেউলের প্রকৃতির বিগ্রহ মৃত। মৃত না হলে, তার পক্ষে এ জীবিকা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। মৃত বলতে একেবারেই মৃত বলছি না। এই প্রকৃতির বিগ্রহও হয়তো জাগে, সম্ভবতঃ সে-পূজারী ভিন্ন কেউ। যাকে শুধু সে-ই চেয়েছে, যার জন্যে শুধু সে নিজে উন্মাদ হয়েছে, বিগ্রহ আপনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে, তার কাছেই সে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। আর সমস্ত, তরুণ প্রগলভ নব যৌবনের শক্তি যাই বল, সবই তো যান্ত্রিক। জীবিকার, প্রাণধারণের অতি দুঃসহ গ্লানি, ভয়ংকর তীব্র ঘৃণা।

বিবাহিত পুরুষ, অবিবাহিত তরুণ, এ দুয়ের তবু একটা বিচার আছে এদের কাছে। কিন্তু চিরকুমারের মূল্য, বিশেষ আমার মত বয়সের কুমার, এদের কাছে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র। বিবাহ না করলে যদি 'কুমার' বলা যায়, সেই হিসাবেই বলছি। অনেক কনফার্মড ব্যাচেলরের কথাই তো শুনেছি। কুমার যে কাকে বলে, বুঝতে পারি না। যাই হোক, আর সকলের মত এদের মনেও নানান সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়, অসুস্থ, অক্ষম, নানা কথা তাদের মনে হয়। কৃপা ও করুণার চোখে দেখে থাকে। কেন, তার ব্যাখ্যা আমার তেমন জানা নেই। মনে হয়, এরাও অর্থের বিনিময়ে যখন নিজেকে সমর্পণ করবে বলেই স্থির করেছে, তখন সেই সমর্পণটাও চায়, বাইরের সংসারের সাধারণ মানুষের কাছে। অসাধারণ বিচিত্র কিছু এদের কাছেও প্রার্থনীয় নয়।

আর এক শ্রেণীর লোকদেরও এদের কাছে উপহসিত এবং ছোট হতে দেখেছি। তারা হল প্রৌঢ় বিপত্নীক ব্যক্তি। এ সবেরই কারণ বোধ হয় এই, আমার মত অবিবাহিত বা প্রৌঢ় বিপত্নীক

লোকেরা যখন এখানে আসে, তখন ধরেই নেওয়া হয়, এদের না এসে উপায় নেই। এদের আর কোথাও কিছু জুটবে না বলেই, বারোবাসরের মেয়েদের কাছে ছুটে এসেছে। আর যারা আসে, তাদের কিছু থাকতেও এসেছে, সুতরাং তাদের মূল্যই বেশী।

এ যেন অনেকটা, দুঃস্থ চাকুরে লোককেও সুদখোরের ধার দেওয়া। কিন্তু নিঃস্ব ভিখিরিকে একটা পয়সাও কেউ দিতে চায় না। কারণ একজনের আছে বলেই সাময়িক প্রার্থনা, আর একজনের কিছুই নেই বলে, নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যে প্রার্থনা! দুয়েতে অনেক তফাত।

যাই হোক, মেয়েটির ঠাট্টায় যে বুকের কোথাও লাগেনি, তা বলতে পারব না। বলেছিলাম, 'জোটা না জোটা বড় কথা নয়। বিয়ে করার চেয়ে, এই বা মন্দ কী।'

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, 'ও, গিন্নিকে খেয়ে বসে আছেন বুঝি? তাই সে কথাটা বলতে পারছেন না।'

বলেছিলাম, 'না, একমাত্র নিজেকে খেয়ে বসে আছি বলেই এখানে ছুটে এসেছি। তোমার অসুবিধে থাকলে বলতে পার, অন্য কোথাও চলে যাই।'

আমার একটু রাগ হচ্ছিল। মেয়েটি সেটা টের পেয়ে আবার হেসে উঠে, আমার গায়ের কাছে লেপটে এসেছিল। বলেছিল, 'না, এবার বুঝতে পেরেছি, সত্যি আপনি বিয়ে করেননি। কিন্তু এতকাল বিয়ে না করে আছেন কেমন করে মশায়?'

মেয়েটির কথাবার্তার মধ্যে এমন একটি সাবলীলতা ছিল, বাচনভঙ্গির মধ্যেও এমন একটি আমাদের সামাজিক পরিচয়ের ছাপ ছিল, ওর কথায় কোথাও কোথাও আমার সম্মানে লাগলেও, চলে যেতে পারিনি। বলেছিলাম, 'সে জবাবটা আর এ বয়সে তোমাকে দিয়ে কী হবে, ও কথা তোলা থাক।'

মেয়েটি মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে ছিল। তারপরে

বলেছিল, 'অবিশ্যি জোর করে কোনো কথা জানতে চাই না। তবে আপনাকে দেখে তো ঠিক, বারো মাসের মেস বোর্ডিং-এর লোক বলে মনে হয় না। আরো দু একদিন আমার ঘরে আগে এসেছেন, বোধহয় মনে করতে পারছেন না। আপনি তো কলেজে পড়ান? আপনি প্রফেসার তো?'

তখন একটু অবাক হয়েই তাকাতে হয়েছিল। হয়তো এসেছিলাম। একই দেহপণ্যার ঘরে একাধিকবার যাওয়াটা আমার মত লোকের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং এটাও মোটেই বিচিত্র নয়, আমি অচিরাৎ সে কথা ভুলে যাব। আমি আসি ও যাই, আসবার সময় একটা মোটামুটি চোখের দেখা দেখে নিই, যাবার সময় ফিরে না তাকিয়েই চলে যাই। আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'সে কথা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বলিনি?'

'না, আপনি বলেননি, আমাকে এ বাড়িরই অন্য একটি মেয়ে বলেছিল। কিন্তু আপনি যে বিয়ে করেননি, সে কথাটা বলেনি।'

আমি দু হাত দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'এসব জানাজানির কি কোনো দরকার আছে?'

মেয়েটি বাধা দিল না। বলল, 'না, দরকার আর কী বলুন। একটু অবাক লাগল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। আপনিও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তো, আমি বিবাহিতা না কি?'

'সে কথা জিজ্ঞেস করা কি অন্যায় হয়েছে?'

'না, অন্যায় কিছুই হয়নি। আমাদের যে আবার বিবাহিত জীবন থাকতে পারে, থাকলে সেটা যে কেমন জীবন, এই ভেবে পাছে আপনি ঠোঁট বাঁকান, তাই আমিও আপনাকে ওরকম জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

নিঃসন্দেহে, মেয়েটি একটু, আমরা যাকে বলি, 'কইয়ে বইয়ে' সেই ধরনের। বলেছিলাম, 'না, আমি তোমাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করিনি। তোমাকে বিদ্রূপও করিনি। তুমি বলছিলে, কাছেই বাড়ি, তোমার বাড়ি যাবার কথা, তোমার বাচ্চাটাকে অনেকক্ষণ

ছেড়ে রয়েছ, তাই বলছিলাম।'

মেয়েটি আমার মুখের দিকে আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়েছিল। আমি একটু নিবিড় হতে চাওয়ায়, সে নিজেই সুযোগ করে দিয়ে, নিবিড়তর হয়ে বলেছিল, 'দেখুন, আমি যদি ভাবতাম, আপনি অবিবাহিত, তাহলে অমন ফট্ করে আমার বাসা বা সন্তানের কথা আপনাকে বলতাম না।'

'কেন?'

'যে কথা বিবাহিত লোককেই বলতে বাধে, সে কথা আপনাকে কেমন করে বলব। আমাদের কাছে যারা আসে, তারা সবাই ভাবে, আমাদের সন্তান-টন্তান কিছু নেই। বরং কানে শুনলে, পুরুষমানুষেরা মিইয়ে যায়। পুরুষদের চাওয়ার তো কতগুলো অদ্ভুত ধরন আছে, সন্তানের মা হলে, সে মেয়ে তো আর মেয়েই রইল না তাদের কাছে।'

বলে মেয়েটি হেসে উঠেছিল, যে হাসির মধ্যে একটা করুণ বিদ্রূপ ফুঠে উঠেছিল। অনুমান করে নিতে পার, করুণা ও বিদ্রূপ, এ দুই-ই পুরুষদের ওপরে বর্ষিত, এবং সে পুরুষ কিন্তু আমি একলা নই। এ ক্ষেত্রে পুরুষ জাতিই মেয়েটির বিদ্রূপ ও করুণার লক্ষ্যস্থল। আবার বলেছিল, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার উর্বশীর মত না হলে, আমরা আর ওদের কাছে কী রইলাম! তাই এ সব কথা আমাদের বলতে নেই। ব্যবসার একটা লাইন আছে তো।'

এরকম একটি বারোবধূর চরিত্র তোমার কাছে নতুন লাগছে হয়তো। হয়তো অবাকও হচ্ছ। কিন্তু এতে খুব অবাক হবার কিছু নেই। তেমন না হলেও, মোটামুটি পড়াশোনা করা কিছু মেয়ে আছে। বিস্তৃত কিছু না, সীমাবদ্ধতার মধ্যেই, অনেকে বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। হয়তো পড়াশোনা না করে, বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গগুণেই, অনেকে অনেক কিছু জেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা এখানে একেবারে অচল না। বঙ্কিম শরৎও যথেষ্ট পরিচিত। আধুনিক সাহিত্যের তো কথাই নেই। তবে সবাই না, কিছু

কিছু মেয়ে, মোটামুটি পড়াশোনা করে, বা এ জীবনে আসবার আগে করেছে। তবে এ মেয়েটি যেভাবে উর্বশী কবিতার কথা বলল, তাতে আমিও কিঞ্চিৎ মুগ্ধ এবং অবাক হয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তবে আমাকে বললে কেন?'

'সেটা আমার ভুল হয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বিবাহিত। তা ছাড়া আরো দু একবার আমার ঘরে এসেছেন। তাই হঠাৎ বলতে সাহস পেয়েছিলাম। মানে—।'

মেয়েটি থেমে গিয়েছিল, কথা শেষ করেনি। আমিই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মানে? থামলে কেন, বল।'

মেয়েটি একটু হেসেছিল, 'মানে, আমাদের সব মেয়েদেরই জারিজুরি তো বিবাহিত লোকের কাছে ধরা পড়ে যায়। একটু চোখ খোলা রাখলে, খেয়াল রাখলে, কতটুকু ধরা দিচ্ছি না দিচ্ছি সবই তারা বুঝতে পারে। তা ছাড়া, ছেলেমেয়ে হয়েছে কি না, এটা তারা ভালই বুঝতে পারে, শরীরে কিছু চিহ্ন থাকে তো। তাই, আমি ভেবেছিলাম, আপনি বিবাহিত, আমাকে আগেও দেখেছেন, আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন, আমার গায়ে আমার বাচ্চার চিহ্ন আছে। তাই বলেছিলাম। ভেবেছিলাম, এ বয়সে কি আর বাবা হতে আপনার বাকী আছে?'

এ কথাটা শোনার পরে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। মেয়েটির সারল্যের এমন ভয়ংকর একটা আঘাত ছিল আমার প্রতি, যা ও কিছুই অনুমান করতে পারেনি। খুব অকপট ভাবেই মেয়েটি তার কথা আমাকে বলেছিল। সত্যি, বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে জীবনযাপন কাকে বলে, আমি জানি না। আর কোনোদিন জীবনে জানতেও পারব না। সব থেকে নিষ্ঠুর ও করুণ বলে বোধ হচ্ছিল, যখন মেয়েটির মুখে শুনলাম, ও আমাকে শুধু বিবাহিত ভাবেনি, আমাকে সন্তানের পিতা বলেও ভেবেছিল। যে কারণে, ওর বিশ্বাস হয়েছিল, একাধিক দিন দেখা ওর শরীরে আমি ওর সন্তানের চিহ্ন চিনতে পারব।

পৃথিবীতে কত বিস্ময়, কত বৈচিত্র্যই আমার অজানা রয়ে গেল। আমি এত কথা জানতাম, এত কথা এ পর্যন্ত শুনেছি এবং সত্যি বলতে কি, একদিক থেকে আমি আমার জীবনে যত মেয়ের সঙ্গ ভোগ করেছি, আর কজনেই বা তা করেছে, তবু এমন বিচিত্র কথা কখনো শুনিনি, মায়ের গায়ে তার সন্তান চিহ্ন রেখে দেয়। এত মেয়ে দেখেছি, এই মেয়েটিকেও তো দেখলাম, কিন্তু আমি জানি না, সে চিহ্ন কোথায়। তার রূপ কী, তার রকম কী। এবং কোনদিন জানতেও পারব না।

একথা মনে হতেই, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করেছিল, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, কেমন করে তা চেনা যায়। কিন্তু আমার সঙ্কোচ হয়েছিল, একটা ভয়ও হয়েছিল, পাছে মেয়েটি আমাকে বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, মেয়েটি বলেছিল, 'কী, চুপ করে রইলেন যে?'

বলেছিলাম, 'কী বলতে পারি বল। তুমি যা বললে, আমি তার কিছুই জানি না। তাই তোমার কথাগুলোই ভাবছি।'

মেয়েটি হেসে উঠেছিল আবার। বলেছিল, 'এতে জানাজানির আর কী আছে। এ এমন কী আর হাতী ঘোড়া ব্যাপার।'

বলে মেয়েটি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় নিজেকে দেখিয়ে বলেছিল, 'এই তো দেখুন না, এই সব দাগ, এরকম রং, শরীরের এসব জায়গায় কখনো অবিবাহিত মেয়েদের দেখতে পাবেন না। ছেলেপিলে না হলে এ রকম চামড়ায় ফাটা ফাটা দাগ দেখা যায় না। বুকের চেহারা আর রঙও এরকম হয় না। আজকাল তো শুনতে পাই, বইয়েতেও এসব অনেক লেখা থাকে। পড়ে দেখেননি?'

মেয়েটি তার শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ অবলীলাক্রমে আমাকে খুলে দেখিয়েছিল। এবং সে মিথ্যে বলেনি, নিশ্চয়ই সে জানত, ওসব বিষয় আজকাল নানান ভাবে লেখা হয়, সেসব বই প্রচুর বিক্রীও হয়। কিন্তু আমি কখনো তা খুলে দেখিনি। সেকস্ সম্পর্কে নাকি সকলেরই

সাধারণ কৌতূহল থাকে। সত্যি বলতে কি, আমি তা কখনো অনুভব করিনি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই, যৌন বিষয়ে সকলের মনের মধ্যে যে একটা নিবিড় আকুলতা আছে, ভয় আছে, এবং নারীর দেহ-যৌবন বা প্রেম ও বিবাহিত জীবন সম্পর্কে পরম কৌতূহল আছে, আমার তা নেই। নারীদেহ জানবার বোঝবার বা নিজের সঙ্গে তার আচার আচরণের কারণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে জানবার যে একটা আকাঙ্ক্ষা, তা আমার কখনো হয়নি। বোধহয়, মানুষ সামগ্রিকভাবে কিছু জানবার থেকেও, যখন জীবনে কেউ আসে, যাকে পাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়, প্রেমিকা বা বিবাহিতা স্ত্রী, যাদের সঙ্গে ভালবাসা হয়, তখনই হয়তো সে তাকে বোঝবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব কৌতূহলে কিছু সন্ধান করতে থাকে। আমার জীবনে সে সুযোগ কখনো আসেনি যে, একজন বিশেষ কাউকে জানবার ও বোঝবার জন্যে বই ঘাঁটতে আরম্ভ করব, বা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হব। আমার জগত সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে জানবার বোঝবার কিছু নেই। সেখানে দেহই সব, এবং তাও দেহোপজীবিনীর। কিন্তু তার কোন বিচার নেই, পরস্পরের সুখ দুঃখের প্রশ্ন গৌণ, নগদ মূল্যে বিক্রয়ের কারবার মাত্র। যৌনতাই সেখানে সর্বস্ব, অনেকটা মহোৎসবের অষ্টমপ্রহর নাম গানের মত, শুধু নামই আছে, অতি ভীষণ রকম আছে, কিন্তু তার গান নেই, কোন বাণী নেই, পালা নেই, সুর নেই। এই অষ্টম প্রহরের আসরে, সঙ্গীতে তুমি কৃতবিদ্য কিনা, তোমার কোনো কারুমিতি জানা আছে কিনা, তুমি তার চর্চা কর কি না, তা কেউ জানতে চায় না। নাম কর, নাম কর, কেবল নাম কর। সেকস্‌-এর রূপ যেখানে এই, সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রশ্ন নিরর্থক।

বলেছিলাম, 'না, ও বিষয়ে বই-টই পড়া আমার নেই, মনেও হয় না পড়ার কথা।'

মেয়েটি চোখের কোণ দিয়ে অপাঙ্গে তাকিয়ে হেসেছিল। আমি অবিশ্যি আমার যৌবনকালের সূচনা থেকে এসব হাসিই দেখে এসেছি, যার পরিচয় সম্পূর্ণ করে তোমাদের জানা নেই। যেটুকু জানা আছে,

সেটাকে তোমরা যাকে বল, এক কথায় 'ভাল্গার'। হেসে মেয়েটি বলেছিল, 'আপনি একেবারে হাতে কলমেই সব জানতে চান, এই তো?'

বলতে বলতে মেয়েটি আরো রঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল। এর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হতে পারে মেয়েটি কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আমার অভিজ্ঞতা অবিশ্যি তা বলে না। বরং হয়তো একেবারেই বিপরীত। তাড়াতাড়ি ছুটি চাইছিল বলে হয়তো, আমাকে উত্তপ্ত করার নিতান্ত যান্ত্রিক ভঙ্গিগুলো সে প্রয়োগ করছিল। এবং সন্দেহ নেই, আমার নিশির ডাকের যে ঘোর, তা ক্রমেই আমার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করছিল, তার কেন্দ্র থেকে। সে আমার স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহে, একমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে, আগুনের প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছিল!

তাছাড়া, এই মেয়েটির প্রতি আমি যেন অনেকটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করছিলাম। না, শরীর খেলাটা এখানে কোনো নতুন ব্যাপার নয়। না খেলাটাই নতুন, বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ মেয়েটি যেভাবে, আমার মত একজন প্রৌঢ় বয়স্ক লোককে, তার অনভিজ্ঞ চোখের কাছে, বিশেষ ভাবে মেলে ধরেছিল, এমনটা সচরাচর ঘটে না। ও যেন একটি অনভিজ্ঞ শিশুকে জ্ঞান দেবার জন্যে, বইয়ের পাতা খুলে দেখাবার মত, নিজেকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি ওকে যখন আরো নিবিড় করে টেনে নিয়েছিলাম, তখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা বিয়েটা করেননি কেন মশাই?'

তখন আমার একবার এমন সন্দেহও হয়েছিল, মেয়েটির দেহ আজ শ্রমে পরান্মুখ। অনেক সময় হয়, ওরা শরীর ঠিক না থাকলে শুধু কথাবার্তা বলেই সময় কাটিয়ে দেয়। এমনকি, পুরুষের আকাঙ্ক্ষা অন্য পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমার এই বয়সে অবিশ্যি প্রত্যক্ষ দৈহিক আচরণের জন্যেই, আজ আর আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে আসে না। আমার ভাগ্যের অসহায়তাই টেনে নিয়ে আসে। তখন, সারাদিনের শেষে, এই সব পল্লী, এইসব মেয়ে, এইসব পরিবেশ

আমার মস্তিষ্ক জুড়ে একটা অবসেশনের সৃষ্টি করে। একটা শূন্যতার, একটা অসীম শূন্যতার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, আমি ছুটে চলে আসি।

আমি কথা বলতে আপত্তি করিনি। বলেছিলাম, 'বিয়ে করবার কথা আমার মনে হয়নি।'

'অদ্ভুত কথা শোনালেন দেখছি। কেন, বিয়ের বয়সে খুব বড় পণ্ডিত হবার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন বুঝি?'

জানি, ওর কথার মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ হুল ছিল। ওর বিদ্রূপের মূল কথা ছিল, 'তখন মনে করেছিলেন, জীবনে পণ্ডিত হলেই সব কিছু পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন এই বয়সে, এই পাওয়ার জন্যে ছুটোছুটি করে মরতে হচ্ছে।'

বলেছিলাম, 'না, পণ্ডিত হবার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম না। কিসে যে ব্যস্ত ছিলাম, তা জানি না। কিন্তু বিয়ে করেই বা কী লাভ হতো! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বিয়ে হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল।'

'তবু তুমি এখানে!'

'আপনারা যে জন্যে আসেন, আমি সে জন্যে এখানে আসিনি।'

'যে কারণেই এসে থাক, বিয়ের মূল্য তাতে কী রইল।'

মেয়েটি একটু চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল, 'ধরে নিন, স্বামী পুত্রকেই খাওয়াই পরাই।'

এরকম ঘটনা আমার কিছু যে না শোনা ছিল, এমন নয়। বলেছিলাম, 'তবু কি একে বিবাহিত জীবন বলতে হবে নাকি?'

'অন্যরকম চাকরি করলে বলতেন তো?'

'তা বলতাম।'

'কি করব বলুন, লেখাপড়া শিখিনি। আমাদের বাড়ির আবহাওয়াটাও ভাল ছিল না। আমার বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছলেন, মায়েরা দু বোন আগের থেকেই গোলমাল সুরু করেছিল। তারপর পাকাপাকিভাবেই এ লাইনে চলে আসে। হয়তো

এক সময়ে ইচ্ছে ছিল, আমাকে একটা ভাল বিয়ে দেবে। কিন্তু যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হল, তিনি একেবারেই জাতের পুরুষ যাকে বলে। তার দৌরাত্ম্যে, মা মাসীর ইচ্ছায়, আমিও এখানে চলে এসেছি। স্বামী এখন আমার ঘাড়ে বসেই খান, নেশাও করেন, এমনকি, দরকার হলে এসব পাড়ার আশেপাশেও আসেন।'

মেয়েটি নিজেকেই বিদ্রূপ করছিল, নাকি একটি ব্যথা ফুটে উঠছিল তার গলায়, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তার বাচনভঙ্গির মধ্যে এমন একটা স্পষ্টতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, যাতে প্রায় একটি ব্যক্তিত্বের সুর ফুটে উঠছিল। যদিও, এইসব মেয়েদের মধ্যে এরকম কাহিনী যে আমার একেবারে শোনা নেই, তা নয়।

বলেছিলাম, 'তাড়িয়ে দিলেই তো পার।'

'ওই তো মশাই, সে কথা বলে কে। চেষ্টা করেও যে এটা পারা যায় না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তুলনা করলে কি আপনাদের চলে।'

নিজের প্রসঙ্গটা সে এড়িয়ে গিয়েছিল। আর সেই সময়ে সহসা আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। অনেককাল আগে, আমার তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সের ঘটনা। কুসুম নামে সেই একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আমার জীবনের···।

কিন্তু না, এসব কথা থাক। এই মেয়েটির প্রসঙ্গও দীর্ঘ করে কোনো লাভ নেই! ওর কথাবার্তাগুলো এমন একটা সহজ স্পষ্টতার দাবী রাখে, যে কারণে এতগুলো কথা লিখে ফেললাম। সত্যি বলতে কি, এসব মেয়েদের মধ্যেও, এমন আশ্চর্য বলিষ্ঠ মনোভাব, সহজ সামাজিকতার পরিচয় পেয়েছি, এমন আশ্চর্য ঘরোয়া ছন্দে বেজে উঠতে দেখেছি, সেসব মেয়েকে আমি আমার অভ্যস্ত চোখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার গৃহ ও জনপদের মাঝখানে, সব আচার আচরণ কণ্ঠস্বর ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে যেমন

ঝলকে উঠেছে, এও তেমনি। আমাদের গৃহ বা সমাজের নিরঙ্কুশ প্রশংসা করবার কিছু নেই, আশা করি এটা তুমি বিশ্বাস কর। নিতান্ত ভাগ্যের জোরে, পরিবেশের বন্ধনে, যারা জীবনধারণ করছে গৃহে জনপদে, তাদের মধ্যে সীমাহীন অপবিত্রতা, নোংরামি, নীতিহীন নির্বিচার ভোগ, কপটতা শঠতা আমি দেখেছি। এক্ষেত্রে মেয়েদের কথাটাই কিন্তু বিশেষ করে বলছি, দোহাই, এটাকে নারী-জাতির প্রতি কোনোরকম অন্ধ অবিচার ভেবে নিও না। তবু যেমন ধর, প্রিয়ংবদা কিংবা আমাদের কলেজের মহিলা লেকচারার শ্রীমতি সরস্বতী, এঁদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যেমন কথাবার্তায় আচার আচরণে ফুটে ওঠে, বারোবধূদের মধ্যেও আমি সেরকম কখনো কখনো দেখেছি, কিন্তু সহ্য করতে পারিনি, বরং তাতে অস্বস্তি বোধ করেছি।

জান তো, আমাদের মত লোকেরাই বেশী গোঁড়া হয়। এসব অসহ্য হওয়া বা অস্বস্তি বোধ করার কারণ তাই-ই। অনেকটা গোয়েন্দা বা পুলিশের মত বলা যেতে পারে। এঁদের যেহেতু অধিকাংশক্ষেত্রে অপরাধীদের নিয়ে কারবার করতে হয়, সেজন্যে মনটা নিয়তই সন্দেহে দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে। আমি যেহেতু জীবনের এই প্রায় সায়াহ্ন পর্যন্ত লুকিয়ে চলেছি, কারণ, আমি সিদ্ধান্ত করেই নিয়েছি, সমাজের পাপাচারের এক অন্ধকারের মধ্যেই আমার অসহায় জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, অতএব গৃহজনপদ সমাজকে আমি দূরে রাখতে চাই। কখনো যেন এই পাপাচার স্পর্শ না করে বা এই অন্ধকারের মধ্যে মুক্ত জগতের নিঃশ্বাস বা কণ্ঠস্বর না শোনা যায়।

কিংবা, এভাবেই বলা বোধহয় ভাল, পাপ যেহেতু আমার আয়ত্তে, সুতরাং আমিই সেহেতু পুণ্যের জন্য চীৎকার করব। আমার সমস্ত কিছুর মধ্যে ফুটিয়ে তুলব একটি সচেতন পরিবেশ। কারণ পাপের জগতে পুণ্যের বাণী শুনতেও আমি নারাজ।

না হে সাহিত্যিক, কথাটা আমি বোধহয় তোমাকে ঠিক

বুঝিয়ে বলতে পারছি না। বরং এভাবে বললেই বোধহয় ভাল হয়, আমি যেন অনেকটা অশিক্ষিত নিপীড়িত অস্পৃশ্যের মত অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে, অতি সন্তর্পণে, উঁচু জাতের সীমানা এড়িয়ে চলেছি। ভয়টা উঁচুদের নয়, আমারই। আমিই বরং ভয়ে ভয়ে, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছি, পাছে ছোঁয়াছোঁয়ি করে একটা পাপ করে বসি। উঁচুদের জাতকাটের মানুষেরা যাই বলুন, আমার ধারণা, তাঁদের শাসনের থেকেও, অস্পৃশ্যদের নিজেদের ভিতরের অন্ধকার অনেক বেশী গাঢ়।

কাশীতে একবার একটি ঘটনা দেখেছিলাম। কোনরকমে একজন অচ্ছুত এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ব্যাপারটা আদপেই খেয়াল করেননি। তিনি যেমন চলে যাচ্ছিলেন, তেমনি চলেছিলেন। গোলমাল লাগল অচ্ছুতটির। সে ব্রাহ্মণের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। যাতে তিনি ওকে গালাগাল দেন, অপমান করেন, এমনকি অভিশাপ দেন, তারপরে যেন ক্ষমা করেন। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি কিছু বুঝতেই পারেননি। ভেবেছিলেন, এমনিই চলেছে লোকটা তাঁর পাশে পাশে। তারপরে একসময়ে তিনি শুনতে পেলেন, 'হে ঠাকুরবাবা, আমার অপরাধ নেবেন না'।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, কী অপরাধ তুমি করেছ?'

অচ্ছুত প্রায় কেঁদে উঠে বলল, 'জানি আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখছেন, আমি অপরাধ স্বীকার করি কি না। কিন্তু ঠাকুরবাবা, আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

স্বভাবতই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সন্দেহ হল, ডোম জাতীয় লোকটা কোনরকম নেশা করে এসেছে। তিনি হেসে বললেন, 'আচ্ছা, যা আপনা ঘর যা।'

অচ্ছুতের নিজের পাপ সম্পর্কে সন্দেহ আরো বাড়ল। সে অনুমান করে নিল, তাকে ক্ষমা না করে, তিনি ভুলিয়ে-ভালিয়ে, সরিয়ে দিতে চাইছেন। তখন সে আবার বলল, 'ঠাকুরবাবা, এমন অপরাধ আর কখনো আমার হবে না।'

তখন ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অপরাধ তুই করেছিস্?'

সে বলল, 'কেন আর আমাকে নিয়ে ছলনা করছেন, আপনি তো সবই জানেন।'

তিনি বললেন, 'না, আমি কিছুই জানি না।'

অচ্ছুত হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমি জানি, আপনি আমার ওপর একেবারে নারাজ হয়ে গেছেন, দোহাই ঠাকুরবাবা, নারাজ হবেন না। পাপীকে ক্ষমা করুন।'

তখন ঠাকুরবাবা চটে উঠে বললেন, 'তুই ব্যাটা নেশা করে আমার পেছনে লাগতে এসেছিস্! জুতিয়ে আমি তোর মুখ ভাঙব।'

দেখলাম, অচ্ছুতের চোখে একটু আলোর জ্যোতি ফুটেছে। বোধহয়, ঠাকুরবাবার মুখনিঃসৃত কটুবাক্যে তাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দিয়েছিল। অচ্ছুত বলেছিল, 'কেন মারছেন না আপনি। আমাকে মারুন, মেরে শান্ত হোন, তবু আমাকে ক্ষমা করুন।'

স্বভাবতই ইতিমধ্যে লোকজন জমে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ ঠাকুরবাবা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি অবিশ্যি অস্পৃশ্য লোকটাকে গায়ে হাত দিয়ে প্রহার করতে নারাজ, কিন্তু সেই ছুঁচো ইঁদুরের বাচ্চাটা যদি এবার পরিষ্কার করে না বলে, ঘটনাটা কী ঘটেছে, তা হলে এবার তিনি নির্ঘাৎ থান ইঁট ছুঁড়ে ওর মাথা ফাটিয়ে দেবেন।

অচ্ছুতের ভাব দেখে আমার মনে হল, যাক্, ব্রাহ্মণ ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, তিনি মনে মনে নিশ্চয় অভিশাপ দিয়ে চলে যাচ্ছেন না। ক্রোধ জাগ্রত করতে পেরে, সে আরো সুখী হল। তখন সে বলল, 'ঠাকুরবাবা, আপনি কি সত্যি জানেন না, আপনাকে আমি ছুঁয়ে দিয়েছি!'

'ছুঁয়ে দিয়েছিস? ওরে হারামজাদা, কখন ছুঁয়ে দিয়েছিস?'

'আপনি যখন ঘাটের পাশ থেকে চকের দিকে আসছিলেন, তখনই আমি সে পাপ করে ফেলেছি ঠাকুরবাবা।'

'কিন্তু আমি তো তা জানি না।'

লোকজনদের মধ্যে কেউ কেউ হাসাহাসি যে না করছিল তা

নয়। তবু, আমি দেখেছিলাম, অনেকের চোখেই, অস্পৃশ্যটির প্রতি একটি প্রশংসা ফুটে উঠেছে। যদিও ঠাকুরবাবার এই না জানাটা সে কখনোই বিশ্বাস করেনি, তাই আবার বলেছিল, 'এই নরাধমে ক্ষমা করুন ঠাকুরবাবা। আবার কেন এ কথা বলছেন, আপনি জানেন না। আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, আপনার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। আপনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে হনহন করে এগিয়ে চলে এলেন।'

তখন ঠাকুরবাবা বললেন, 'আচ্ছা, আমি স্নান করে নেব। তোকে ক্ষমা করলাম, আর কখনো এবকম করিসনি।'

'কোনদিন না ঠাকুরবাবা, আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না। যদি জানকী, আমার ঘরওয়ালীর মুখ হয়ে থাকে, আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখব, তবে ওর মুখ আজ আমি ছিঁড়ে ফেলব। কারণ তার জন্যেই আমি এত বড় পাপ করেছি। ঠাকুরবাবা, আপনি ওকেও ক্ষমা করবেন।'

'হ্যাঁ, ওকেও ক্ষমা করলাম।'

তারপরে অস্পৃশ্যটি প্রায় যেন দিগ্বিজয় করে চলে গেল। সমস্ত ঘটনাটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর, কিন্তু আজও মনে করে রেখেছি। গল্পটা সবখানি শোনাবার উদ্দেশ্য এই নয় কি যে, আমি অস্পৃশ্যটির মত একটা আঁধারে পড়ে আছি। আমি শুধু ভয় ও সংস্কারের দিকটাই দেখালাম, যার রকমফের আমার মধ্যেও কাজ করে।

যাই হোক, কুসুমের কথা আমি তোমাকে পরে বলছি। এই রাত্রের মেয়েটির প্রসঙ্গও এখানেই থাক। আমার নিশির ডাকের যা দাবী, তা ও মিটিয়েছে। ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ও ব্যস্ত নয়। যখন শুনল, ওর আপত্তি না থাকলে, আমি বসে একটু কাজ করতে চাই, তাতে একটু অবাক হয়েছে, এবং শুয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

এখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এই বারবধূদের পাড়াও এখন স্তব্ধ। কিছু হারমোনিয়ামের সুর বা তবলার বোল অথবা পায়ের

ঘুংগুরের স্খলিত কোনো শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। এটা হয়তো তোমার কাছে কিছুটা বিচিত্র বোধ হতে পারে, এখানে, রাত্রে বসেই কেন আমি লিখছি। সে কথা তোমাকে আগেই ব্যক্ত করেছি, দিনের বেলায় কাজে-কর্মে পরিবেশে, আমার সমস্ত কিছুই বদলে যাবে। তখন আমার নিজের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। যার শেষ হয় আবার সন্ধ্যার পরের শূন্যতায়।

বলতে পার সাহিত্যিক, তুমি কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস কর! বোধহয় কর না, এবং বলতে পারি হঠাৎ আমার এই জ্যোতিষ-শাস্ত্র উল্লেখের কথা শুনে হয়তো মনে মনে হেসে উঠছ। বৈচিত্র্যতম এই মানুষের জীবনের সঙ্গে, কোথাও হয়তো কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নিতে চাও না। কারণ সকল শাস্ত্র, ধর্ম, শাসন, নীতি, যা কিছু, সবই মানুষের জীবনের কাছে হার মেনে গিয়েছে। কথায় বলেছে, নারী ও নদীর গতিপথের কথা কেউ বলতে পারে না। আমি এত ছোট করেও দেখতে বলছি না। কেবল নারী ও নদী কেন, আমার মনে হয়, সমগ্র মানুষের। তার সমাজের, ইতিহাসের। কোনো বিষয়েই কোনো শাস্ত্রের দ্বারা বোধহয়, ভূত-ভবিষ্যৎ অন্তিম বলে দেওয়া যায় না। শাস্ত্রের নিজেরই অবিশ্যি কতগুলো নিজের প্রবচনের সঙ্গে ঘোর অমিল রয়েছে। এক মুখে সে যখন পুরুষের ভাগ্য ও নারীর মনের হদিস কিছুই বলতে পারা যায় না বলে ঘোষণা করছে, তখনই আর একজন গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান মিলিয়ে, পুরুষের ভাগ্য ও নারীর মন নির্ণয়ের বিষয় প্রকাশ করছে।

অতএব, ও ব্যাপারে অর্থাৎ জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিষয়ে, বিবেকানন্দের বক্তব্য মেনে নিলেই বোধহয় সকল গোলযোগ মিটে যায়। যার যা কাজ সে করুক, আপন কর্মের ভোগ সে করবে, কার কোষ্টি গ্রহ নক্ষত্র কী বলেছে, সে খোঁজে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বিবেকানন্দ আর এই প্রতিমুহূর্তেই নিরাপত্তাহীন সংস্কার-

বাদী সংসারের মানুষের মধ্যে তফাত আছে। তিনি যোগ-বীর, কর্মবীর, তিনি আপন কর্মের সব ফল দুহাত ভরে নেবার জন্যে অকুণ্ঠে প্রস্তুত ছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই বোধহয়, এক ঈশ্বরকে স্মরণ করতে গিয়ে, নানান পূজা আচার বিধির আশ্রয় সে নেয়। না নিয়ে বোধহয় সে পারবে না। সেই জন্যেই, হলকর্ষণের দিনক্ষণ থেকে, প্রতিটি মুহূর্তের ভয় ও সংশয়জনিত কারণে, বিবেকানন্দ যা শোনাতে পারেননি তাঁর দেশবাসীকে, পঞ্জিকাকারেরা তার চেয়ে অনেক বেশী তাদের আত্মাকে দখল করে বসে আছে।

বিশ্বসংসারের প্রকৃতি যে খুবই অদ্ভুত, তা তুমি আমার থেকে কম জান না, বরং ধরেই নিচ্ছি, আমার থেকে ও বিষয়ে তোমার দৃষ্টি অনেক বেশী বিস্তৃত, সজাগ। মতভেদ থাকতে পারে, আর সেটা থাকাই তো স্বাভাবিক। যেমন ধর রবীন্দ্রনাথ, টলষ্টয়, যাঁদের কথা দিয়ে বললে, আমাদের জীবনের কথা আরও পরিষ্কার করা যায়। দেশবাসী বা বিশ্ববাসী খুবই ধন্য নিঃসন্দেহে যে, এই জাতীয় মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই এক একজন পরাজিত দিকপাল বলে আমার ধারণা!

আমাদের হিসেবে কী বলে, আমি জানি না, কিন্তু বিশ্বমানবের কোথাও আমি রবীন্দ্রনাথ টলষ্টয়কে খুঁজে পাইনি। কথাটা যদি তোমাকে আহত করে, আমাকে ক্ষমা করো। যাঁদের আবির্ভাবের পেছনে, দেশের মানুষের সমাজের কতগুলো বিশেষ কারণকে আমরা খুঁজে পেতে চেয়েছি, তার কোনোটাই যে ঘটেনি, তাঁদের প্রেরণা যে এই বৃহৎ মানবসমাজের পরিচালনায় সত্যি কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এ কথাটা আশা করি বিশ্বাস কর। কারণ, তাঁরা যা চাননি, বা তাঁরা যা চেয়েছিলেন, আমাদের অন্তরের, সমাজের মধ্যে কোথাও কি তার কোনো প্রমাণ সত্যি দেখেছ? অন্যদিনের বিশ্ব বা আজকের ভারত, এর মধ্যে কোথাও কি রবীন্দ্রনাথ টলষ্টয় বিবেকানন্দ আছেন? শুধু তর্কের খাতিরে কিছু বলো না, এই

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। তোমার নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে।

এর দ্বারা আমি কোনো হতাশা সৃষ্টি করতে চাই না। আমি যাঁদের কথা বললাম, এঁরা কেউই ধর্মপ্রচারক নন, মনুষ্যধর্মের প্রবক্তা। আমরা যাকে ধর্ম বলি, তার সঙ্গে মনুষ্যধর্মের বিরাট তফাত। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সেই ধর্মের কাছে সমগ্র পৃথিবী যে পরিমাণে আত্মসমর্পন করে বসে আছে, এবং বসে থেকে যত নিরাপদ ও শান্তি বোধ করছে, তার যেমন অখণ্ড প্রতাপ, সারা পৃথিবীতেই সেই হিসেবে মনুষ্যধর্মের প্রবক্তা সাহিত্যিক কবি-দার্শনিক শোচনীয়ভাবে পরাজিত। ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ বলতে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে রাখার কথাই বলছিনে, তার সঙ্গে ধর্মের বিশাল সীমানা জুড়ে, মানুষের গভীরতর মূল পর্যন্ত, তার বিশ্বাস আচার আচরণ, যেগুলো হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে, আজো তার সেই একই অভিব্যক্তি! এই এ্যাটমের যুগেও। কেবল তার বাইরের চেহারাটাই বদলেছে।

এসব কথা এ জন্যেই বললাম, সংশয়বাদী মানুষদের কাছে, মহামানবদের বাণী টেকে না, টিকতে পারে না। তুমি যতই বিজ্ঞান, যুক্তি দিয়ে বোঝাও, আপন কর্মের চেয়ে ভাগ্যকে মানুষ তেমনই বেশী বিশ্বাস করে এসেছে, আজও করছে। অজ্ঞানতাই বল, আর যাই বল, ব্যক্তিমানুষ যেহেতু কোনো রকমেই তার নিজের ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করতে পারে না, প্রতি মুহূর্তেই নিজের ও অপরের জয় পরাজয়ের বিচিত্র লীলা খেলা সে দেখছে, সেইহেতু স্বাভাবিক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মধ্যে একবার সে নিজেকে দেখতে চাইবে। সাহস করে কজন তা দেখতে চায়, জানি না। কৌতূহল নিশ্চয় মানুষের আছে। তবু ভাল কিছু জানবার জন্যেই মানুষ ব্যাকুল হয়ে থাকে।

এর দ্বারা আমি আমার মতামত সঠিক ব্যক্ত করতে পারছি না, আমি বিশ্বাস করি কি না। সাধারণভাবে যে অর্থে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যুক্তিগুলো দেওয়া হয়, এবং যেটা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য বলে বোধ হয়, তা হল, বহু মানুষের জন্ম তারিখ

ক্ষণ, সেইখানে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান, ইত্যাদি জনিত কারণে তার জীবনযাত্রার যে ফলাফল ওরই ভিত্তিতে অপরের কোষ্ঠি বিচার। পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক না হলেও, মোটামুটি একটা সংকেত আমরা এ ক্ষেত্রে পাই, যদিও কল্পনার আশ্রয় কিছুতেই ছাড়া যায় না। এ ক্ষেত্রেও কল্পনার আশ্রয় কিছুটা আমাদের গ্রহণ করতেই হয়। অবিশ্যি, বহু মানুষের জীবন যাপনের ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য করে, সত্যিই আরো বহু মানুষের জীবনযাপনের অতীত ভূত ভবিষ্যৎ বলা যায় কি না, এবং ওকে বিজ্ঞানের সংকেত বলে মেনে নেব কি না, এ বিষয়েও আমার সংশয় যথেষ্ট আছে।

ধরা যাক, রাজা ইদিপাস্-এর কথা, ভবিষ্যৎবাণীর জন্যেই যাকে জন্মলগ্নেই মৃত্যুবরণের জন্যে মায়ের কোল ছেড়ে ঘাতকের হাতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাকে হত্যা করতে পারেনি, আপন মায়ের গর্ভে সন্তান উৎপাদক রূপে নিজেকেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তোমাকে এ কথা লিখছি, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। জানি, সুদূর অতীতে মানুষ যে সমাজব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে চাইছিল, হয়তো সেই জন্যেই ইদিপাসের উৎপত্তি। বর্তমানে যে পাপপুণ্য বোধ সমাজে প্রচলিত আছে, তা নিশ্চয় একদিনে তৈরী হয়নি, দীর্ঘ হাজার হাজার বছর ধরেই তা হয়েছে। এবং রাজা ইদিপাস তারই চিহ্ন হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা পাপপুণ্যের সীমানায় চলে এল, সেই মুহূর্তেই তার চেহারা গেল বদলে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভোলগা থেকে গঙ্গা পড়ে আমরা বিস্মিত হই বটে, তার বীভৎসতায় চমকে উঠি না। কারণ সেখানেও মাতা পুত্রের সম্পর্কের কথা আমরা পাঠ করি। কিন্তু ইদিপাস যখনই পড়ি, বা টমাস ম্যানের 'হোলি সিনার', তখনই আমাদের বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। যদিও হোলি সিনার-এর ভাই-বোনের ঔরসে ও গর্ভে যে সন্তান জন্মায় আবার সেই সন্তানই অপরিচিত যুবক হয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসে, মা হয় তার অঙ্কশায়িনী, তবু এক ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্তের ভিতর দিয়ে, মুক্তির একটি অপরূপ, চোখের জলে ভেজানো স্নিগ্ধ সুর বেজে ওঠে

শেষ পর্যন্ত।

তবু সেই ভাগ্যকে কি কেউ আগে থেকে জেনে মেনে নিতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বলবার জন্যেই এই সব কথার উল্লেখ করতে হল। আমাদের সমাজের পাপপুণ্যের সঙ্গেই আমাদের সব কিছু জড়িত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মানুষের অবস্থার কথা সত্যি কতখানি ব্যক্ত হতে পারে, তাই বারে বারে আমার জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে সেই মানুষের পাপ এবং পুণ্যের পাল্লায়, জীবনের কোনো ভয়ংকরতার কথা সে কি সত্যি ঘোষণা করতে পারে? এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবু ইদিপাসের কাহিনী যেমন আমার শরীরকে আতঙ্কে শিউরে তোলে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বচন আমার জীবনকে অনেকটা সেই রকমই শিউরে তুলেছে।

সাহিত্যিক, সে জন্যেই তোমাকে লেখার প্রয়োজন হল, সব জেনে এবার তুমি বলবে, আমার ভাগ্যই কেন এই অসহায় দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েছে। না কি ভাগ্য নয়, আমার বংশ, পিতৃপরিচয়, পরিবেশ, আমার শিক্ষা দীক্ষা কোনো কিছুর মধ্যেই আসলে আমার এই দুর্ভাগ্যের বীজ লুকিয়ে ছিল! আমি আমার মনের কথা উষাকালের অস্পষ্টতা থেকে, যতখানি স্মরণীয়, এই জীবন-সায়াহ্নের কাল পর্যন্ত, সবই তোমাকে ব্যক্ত করব। তারই মধ্যে তুমি লক্ষ্য করে দেখ, কোথায়, চেতনার কোন গভীরতর অন্ধকারের গাঢ়তায়, আমার এই আজকের জীবনের বীজ নিহিত ছিল।

এখনো পরিষ্কারই আমার মনে আছে, উপনয়নের সময় আমার সেই মূর্তি। কয়েকদিন নিয়মতান্ত্রিক অদর্শনের পর, আমি যখন দিনের আলোয় সকলের মাঝখানে বেরিয়ে এসেছিলাম, সে সময় আমার ফটো তোলা হয়েছিল। আমি এখনও আমার সেই ফটোগ্রাফখানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আর ভাবি, এই কি আমি সেই কিশোর! যার স্নিগ্ধ চিকন, ঈষৎকৃশ খালি গা, শরীরে নতুন উপবীত ঝুলছে, যার

মুণ্ডিত মস্তকের নিচেই কিশোর ব্রহ্মচারীর দুই আয়ত চোখে পবিত্রতা যেন আপনাকেই গৌরবান্বিত করেছে, যাকে দেখলে মনে হয়, পাপ এর চারপাশে কোথাও ছায়া ফেলতেও দ্বিধা বোধ করবে, সেই আমি কি এই আমি?

সেই সময়েই, আমার জীবনে একটি বিচিত্র মুহূর্ত এসেছিল। আমি কয়েকটি কথা শুনেছিলাম। তুমি তো জান, আমাদের বাড়ি এমনিতেই পণ্ডিতের বংশ। স্মৃতি, ন্যায়, কাব্য খুঁজলে বংশে প্রায় সবরকমই পাওয়া যেত। ব্রাহ্মণ অনুশাসন ও নিয়মকানুনগুলো বরাবরই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পরিবারে মেনে আসা হয়েছে। কোথাও তার কোনো ত্রুটি হবার উপায় ছিল না।

বাবার এক ছেলে বলে, আমার উপনয়নে কিছু সমারোহ হয়েছিল। সমারোহ বলতে একটু বেশী মাত্রায় আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের বলা হয়েছিল। শূদ্রের মুখদর্শন করতে নেই বলে, আমাকে এমন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। বয়সের হিসেবে ধরলে, নিশ্চয় তখনো তোমাদের জন্ম হয়নি। হলেও সদ্য আগত এই পৃথিবীতে। অতএব বুঝতেই পারছ, সেই বয়সে তোমার তুলনায় (?) হয়তো কিছুটা শান্ত ছিলাম, তা বলে খুব একটা ল্যাজবিশিষ্ট ছিলাম না। একটা ঘরের মধ্যে বসে থাকা অতি দুঃসহ। বাড়ির অন্যান্য অংশে যাওয়াও খুব মুশকিল ছিল। সেখানে ঝি-চাকরেরা ছিল। শূদ্রের মুখদর্শন হয়ে যাবে। তাই নিষিদ্ধ কয়েকদিন, একমাত্র দুপুরবেলাটাই আমার হাতে ছিল, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, এমন কি উঠোনে পর্যন্ত যাবার অধিকার। যে অমর্ত এখনও আমাদের বাড়িতে রয়েছে, সে তখনো ছিল। আমি এক একটা ঘর পেরিয়ে যেতাম, আর অমর্ত এবং বেন্দার মা'র (ঝি) নাম ধরে চেঁচিয়ে বলতাম, 'তোমরা ওদিকে কোথাও থাকলে পালাও, আমি বেরুচ্ছি। দেখতে যদি পাই, তবে তোমাদেরই পাপ হবে। তোমরা শুদ্দুর।'

জবাবটা অমর্তের কাছ থেকেই পাওয়া যেত, 'হ্যাঁ, তুমি চলে এস

ডাইনে বাঁয়ে তাকিও না, আমি বড় ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়াচ্ছি।'

চলা-ফেরার গতিবিধিটা প্রায় এ পর্যায়েই এসে পড়েছিল। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকেও সকল জাতের মুখই আমি তখন দেখেছিলাম। এমন কি অমর্তর কালো তেল-চকচকে এবং বেন্দার মায়ের নোলক-পরা মুখটিও। এমনিতেই আমাদের কাশীর পেয়ারা গাছটিতে প্রচুর ডাঁসা পেয়ারা ঝুলছিল। বলতে গেলে, তার রক্ষক ও ভক্ষক দুই-ই ছিলাম আমি। বাড়ির লোকজন, এমন কি অমর্ত পর্যন্ত সে বিষয়ে এত নির্বিকার ছিল যে, এক এক সময় মনে হতো, গাছটার প্রতি কারুর কোনো মায়া-দয়া নেই। সেই ডাঁসা ফলের জন্যেই শেষ পর্যন্ত, পাঁচিলের বাইরে শূয়োর চরানো ডোমটার মুখ পর্যন্ত দেখতে হয়েছে।

যাই হোক, উপনয়নের দ্বিতীয় দিনে, আমি পা টিপে টিপে আমার বন্দীশালা থেকে বেরুতে যাচ্ছিলাম। মা আর দিদির চোখ যদি ফাঁকি দিতে পারি, তবে বাগানে চলে যাবার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু পা টিপে টিপে যেতে গিয়ে, বাইরের দরজার কাছাকাছি এসে, আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। আমি শুনলাম, বৃন্দাবনচন্দ্র ন্যায়রত্ন মশাই আমার নাম উচ্চারণ করছেন। স্বভাবতঃই আমি একটু কৌতূহলীও হয়ে উঠেছিলাম।

বিষ্ণুপুরের বৃন্দাবনচন্দ্র ন্যায়রত্ন, আমার উপনয়ন উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমাদের যে কোনো রকম কাজে-কর্মে উৎসবেই ওঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। যদিচ উনি ছিলেন ঠাকুর্দার খুব বন্ধুস্থানীয় লোক, এবং একসঙ্গেই দু'জনে ন্যায় অধ্যয়ন করেছেন, তীর্থ পর্যটন করেছেন। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরেও, উনি আমাদের বাড়িতে উপলক্ষ বা উপলক্ষ ছাড়াও নিয়মিত এসে থাকতেন। তখন আমার বাবার সঙ্গেও ওঁর কথাবার্তা আলোচনা খুব চলত। বিশেষ করে, উনি আবার জ্যোতিষ-শাস্ত্রও যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন। সে জন্যে উনি কোনরকম পরীক্ষার সম্মুখীন না

হলেও, কোনো জ্যোতিষ-শাস্ত্রী বা জ্যোতিষার্ণবের তুলনায় একটুও কম ছিলেন না। আমাদের বাড়ির প্রায় সকলের কোষ্ঠীই তিনি তৈরী করেছিলেন। শুনেছি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করতেও তিনি সমর্থ ছিলেন।

এখনো আমার মনে আছে, দিদির বিয়ের সময় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেননি। একটা অসুখের কথা জানিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। আমাদের পরিবারের সকলেই তা বিশ্বাসও করেছিলেন। বিয়ের উৎসব মিটে যাবার কয়েকদিন পরে, দিদি জামাইবাবু চলে যাবার পরে তিনি এসেছিলেন। সব কথাও শুনেছিলেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। তারপরে, মাস চারেক পরে, তাঁর একটি চিঠি এসেছিল। সেই চিঠি নিয়ে বাড়িতে এত আলোচনা হয়েছিল যে, আমিও একবার সেই চিঠিখানি পড়েছিলাম। তাতে উনি লিখেছিলেন, 'শ্রীমতী জয়াবতীর (আমার দিদির নাম, তাঁকে বিধবা অবস্থায় আমাদের বাড়িতে তোমরা দেখেছ।) জন্য বড় দুশ্চিন্তা বোধ করিতেছি। গত সপ্তাহকাল সে কোথায় বাস করিতেছে, সে কীরূপ আছে, আমাকে সত্বর জানাইবে। যে কারণে শ্রীমতীর বিবাহে যাইতে আমার দ্বিধা জন্মিয়াছিল, দেখিতেছি সেই কাল অপ্রতিরোধ্য ভাবেই সমাগত হইয়াছে। মানুষের ভাগ্য লইয়া কাহারো বিশেষ কিছু করিবার নাই, একমাত্র আশা দেওয়া যায় মাত্র, কিন্তু মা জয়ার বেলায়, আমার তাহাতেও সবিশেষ সংশয় জন্মিয়াছিল। অতএব জামাইবাবাজী ও শ্রীমতীর সংবাদ পত্রপাঠ আমাকে দিবে।'

পত্রটি লেখা হয়েছিল আমার বাবার নামে। যেদিন ওঁর পত্রটি আসে, সেদিন আমাদের বাড়ির সবাই শোকমগ্ন। মা বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করছিলেন, বাবা অসুস্থ শরীরে বাগানের সিঁড়ির কাছে বসে নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন। কারণ, সেইদিন সকালবেলাতেই খবর এসেছে, জামাইবাবু মারা গিয়েছেন। জামাইবাবুর শরীর কখনোই খুব একটা সবল ছিল না। বিয়েও মাত্র কয়েক মাস

হয়েছিল। তবু এত তাড়াতাড়ি যে তিনি মারা যেতে পারেন, এ কথা কেউই ভাবেনি। আমি এখনো ভেবে অবাক হই, জামাইবাবু নাকি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, কিসের একটা ছায়া দেখে, রাত্রে ভয় পেয়েছিলেন এবং আমার দিদির সঙ্গে আর একটি কথাও নাকি তিনি আর বলেননি। হঠাৎ-ই, ভয় পাওয়ার দিন থেকে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে, জ্বর আসে, এবং বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। রাত্রে তাঁর ঘর থেকে সবাই যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দিদি গিয়েছিল, কিন্তু জামাইবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁকে চলে যেতে বলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'ছায়া তোমারই পেছনে পেছনে।'

এ কথার কোনো মানে দিদি বুঝতে পারেননি, কোনোদিনই বুঝতে পারেননি। একমাত্র যার অর্থ করা যায় হয়তো জামাইবাবু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন, এবং তিনি কোথাও থেকে শুনেছিলেন, বিবাহের চার পাঁচ মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই হয়তো দিদিকে তিনি চলে যেতে বলেছিলেন, এবং ছায়ার কথা বলে, মৃত্যুরই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। নিজের ভাগ্যের থেকেও, অন্য কাউকে দায়ী করতে পারলে আমরা খুশি হই, এ কথা আগেই বলেছি। জামাইবাবু হয়তো তেমনি একটা অনুমান করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের বাড়িতে সকালবেলার সংবাদে যখন সবাই শোকমগ্ন, তখনই বেলা এগারোটায় ন্যায়রত্ন মশাইয়ের পত্র এক আশ্চর্য উত্তেজনা ও বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছিল। বাবা হিসেব করে বলে উঠেছিলেন, 'এ কি, ন্যায়রত্ন মশাই তো এ পত্র ছদিন আগে লিখে পাঠিয়েছেন, যার অর্থ দাঁড়ায়, জয়ার বর মারা যাবার আগেই তিনি পত্র লিখে বসে আছেন!'

তাঁর বিষয়ে এরকম জাদুকরী ঘটনা আরো আমাদের জানা ছিল। কিন্তু আমাদের পরিবারের ভিতর দিয়ে কখনো কোনো

দুঃখজনক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়নি। জামাইবাবুর মৃত্যুর ঘটনা আমার উপনয়নেরও আগে। ছেলেবেলাকার সে ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারিনি।

তুমি তো জান, ফিজিকস্ হচ্ছে আমার সাবজেক্ট। আমাদের খুড়ো জ্যাঠাদের ছেলেদের এবং আমার, একই সঙ্গে নতুন শিক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছিল। তার আগে আমাদের বংশের মধ্যেও শাস্ত্র-কাব্য ইত্যাদি নিয়ে সকলে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তার সঙ্গে যজমানি ও অন্যবিধ পাণ্ডিত্যও ছিল। আমাদের দিয়েই নতুন শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল।

বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম। এবং জামাইবাবুর মৃত্যু বিষয়ে পরে নিজের সঙ্গেই অনেক তর্কবিতর্ক করেছি। সেই তর্কের মীমাংসা কিন্তু আজও করতে পারিনি। কিন্তু মনের মধ্যে তর্কবিতর্ক ছিল মানেই, সেই ঘটনা আমি ভুলতে পারিনি। বাবা পরে অবিশ্যি ন্যায়রত্ন মশাইকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি যদি সবই জানতেন তবে আগেই সাবধান করে দেননি কেন, যাতে সে বিয়ে স্থগিত রাখা যেত, কিংবা গ্রহ নক্ষত্রের সূত্র ধরে কোনোরকম যাগ যজ্ঞ বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেত।

আমার এখনো মনে আছে, তিনি জানিয়াছিলেন, বিয়ে স্থগিত রাখলে আরো ভয়ংকর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। দিদির বিয়ে হয়েছিল বলেই নাকি তবু বৈধব্য অবলম্বন করতে হয়েছিল, অন্যথায় আরো খারাপ কিছু ঘটতে পারত। তার থেকে বৈধব্যই নাকি ভাল। এবং একথাও জানিয়েছিলেন, ব্যবস্থা অবলম্বনের কিছুই নেই। ওটা একটা সান্ত্বনা মাত্র। মানুষের ভাগ্য একদিকে যেমন সুন্দর হতে পারে, আর এক দিকে তেমনি নিষ্ঠুরতম হতে পারে। তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের এই একটি মাত্র কথাই আমার কাছে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মধ্যে নতুন বলে মনে হয়েছিল। তিনি নিজে পেশাদার জ্যোতিষ-শাস্ত্রী ছিলেন না। একাহারী এবং অনেকখানিই

লৌকিক আচারহীন লোক ছিলেন। তাঁর পরিচিত, পেশাদার জ্যোতিষীরা অনেকেই তাঁর ওপর বিরূপ ছিলেন। কারণ, ব্যবস্থা অবলম্বন অর্থাৎ রাশিফলের গ্রহ নক্ষত্রকে তুষ্টি বিধান করে, তাকে তার স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকে নিষ্ক্রিয় বা অশুভকে শুভ করায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এবং সেজন্যেই আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা তোমাকে না লিখে পারছি না।

যদিচ, সত্যি আমি ফিজিক্সের প্রফেসর, আমি কী যুক্তি দিয়ে এসবকে মেনে নেব, বুঝতে পারি না, কিন্তু ঘটনাকে অস্বীকার করাও তেমনি দুরূহ। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে, তিনি নিজেই বলতেন, 'আমি কি জানি, যদি গোমাংস খেয়ে আমাকে মরতে হয়, তাহলে, এখন থেকেই কী ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করতে পারি? যেখানে জন্ম, সেখানেই মৃত্যু হবে বলেই মনে হয়। তবু সেখানে যদি সেরকম ঘটনা ঘটে, আমি এখন থেকে তার জন্যে কী করতে পারি। লোহার বাসর কি লখীন্দরকে বাঁচাতে পেরেছে?'

সাহিত্যিক, শুনলে আশ্চর্য হবে, বৃন্দাবন ন্যায়রত্নের মুখে একরকম ভাবে গোমাংসই গিয়েছিল। আর সত্যিই তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে মারা যান। একমাত্র বুদ্ধদেব সম্পর্কেই এবম্বিধ ঘটনা জানতাম যে, শূকরের মাংস খেয়ে, অসুস্থ অবস্থায় তিনি মারা গিয়েছিলেন। ন্যায়রত্ন মশাইয়ের বেলায়, ঘটনা তেমন প্রত্যক্ষ বাস্তব নয়।

শেষ বয়সে তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যখন আরোগ্য হলেন, পথ্য পেলেন, তখন কবিরাজ মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে তাঁকে ভাত খাওয়াবার কথা বলেছিলেন। পুত্রবধূ নিজের হাতে রান্না করে শ্বশুরকে খাইয়েছিলেন। ন্যায়রত্ন মশাই ততটা খেয়াল করেননি। প্রথম গরাস পুত্রবধূ কাঁচকলা মণ্ড করে ভাতের সঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন, এবং তারপরেই মাগুর মাছ মুখে তুলে দিয়েছিলেন। দাঁতহীন মাড়িতে মাছ নাড়াচাড়া করতে করতে, স্থবির চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী

দিয়েছ আমাকে ?'

'মাগুর মাছের ঝোল।'

'মাগুর মাছের ?'

তৎক্ষণাৎ থু থু করে তিনি মুখ থেকে সব ফেলে দিয়েছিলেন এবং আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, 'হে ভগবান, হে ভবিতব্য !'

বলতে বলতেই তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। পুত্রবধূ ভয়ে কেঁপে উঠেছিলেন। তিনি জানতেন, শ্বশুরমশাই মাগুর মাছ-টাছ খান না। কিন্তু তিনি একেবারে নিরামিষাশী ছিলেন না। বুড়ো বয়সে বিশেষ মাছ খেতেন না। কবিরাজ মশাই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখের সময় অত মানতে গেলে কি চলে! হয়তো একটু বিশ্রি লাগবে। আর কি হতে পারে! তিনি ভেবেছিলেন, এক একজন যেমন কোনো কোনো মাছ খেতে পারেন না, শ্বশুরমশাইও তেমনি মাগুর মাছ পছন্দ করেন না।

শ্বশুরমশাইয়ের অবস্থা দেখে ভয়ে তিনি তৎক্ষণাৎই বাড়ির সবাইকে ডেকে এনেছিলেন। ন্যায়রত্ন-গৃহিনী তখনো জীবিত। তিনি ছিলেন স্বামীর থেকেও অথর্ব। মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই বিছানায় শুয়ে দিন গুনছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই শোনা গিয়েছিল, ন্যায়রত্ন মশাইয়ের ছেলেবেলায় মাগুর মাছের জন্য তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বলে। ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম : ন্যায়রত্ন মশাইয়ের তখন বছর চৌদ্দ বয়স। সেই বয়সেই সংস্কৃতে যথেষ্ট পড়াশোনা করলেও, যাকে বলা হয় একটু মাঠে ঘাটে ঘোরা ছেলে, সেইরকম ছিলেন।

সেই বয়সে একদিন, গ্রামের বাইরে কোথা থেকে, শুকিয়ে যাওয়া বিলের পাঁক ঘেঁটে, কয়েকটি মাগুর মাছ ধরে এনেছিলেন। সময় তখন ভর দুপুর। এসে তাঁর মায়ের কাছে আবদার করেছিলেন, মাগুর মাছ রান্না করে দিতে হবে। সেই মাগুর মাছ দিয়ে তিনি তখন ভাত খাবেন। মা রেগে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এই ভর দুপুরে তিনি মাগুর মাছ রান্না করে দিতে পারবেন না। শুধু তাই না,

একটু কঠিন হয়েই বলেছিলেন, মাগুর মাছ বাঁদাড়ে ফেলে দিয়ে আসতে।

কিশোর ন্যায়রত্নের প্রাণে, মায়ের কথাগুলো খুবই বেজেছিল। অভিমান করে মাছগুলো তিনি বাঁদাড়েই ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। মায়ের কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, আর কখনো জীবনে মাগুর মাছ স্পর্শ করবেন না। বলেছিলেন, 'একটু মাগুর মাছ রেঁধে খেতে দিতে হবে বলে, তুমি এমন করে বললে? জীবনে আর কখনো মাগুর মাছ স্পর্শ করব না। যদি খাই, তা হলে তা হবে আমার গোমাংস খাওয়া।'

কিশোর ন্যায়রত্নের মা কথাটার তেমন মূল্য দিতে চাননি। ছেলেমানুষের রাগ ভেবে, রাগের সঙ্গে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বলেছিলেন। 'দেখিস, খাঁটি ব্রাহ্মণের এক কথা। সে একবার যা প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনো তার নড়চড় হয় না।'

এখানেই একটা বিস্ময়। মা বোধহয় ছেলেটিকে ঠিক চিনতেন না। চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোর যে মনের দিক থেকে গভীর এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। তখনো হাটে মাঠে ঘোরাঘুরি করা অভ্যাস থাকলেও, নিষ্ঠা এবং আদর্শের দিক থেকে, মনে মনে খুবই সচেতন ছিলেন। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তিনি সর্বদা যে পরিবেশে বাস করতেন, সেটা নিতান্ত টিকি-নাড়া টুলো পণ্ডিতদের ঠুনকো পরিবেশ না। তাঁর বাবা বা ঠাকুর্দাও ছিলেন অত্যন্ত ন্যায় নিষ্ঠাবান পণ্ডিত। মিথ্যা কথা কখনো কেউ বলতেন না। কিশোর ন্যায়রত্ন অল্প বয়সেই সেসব গুণ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সটা আজকের ছেলেদের কাছে কিছুই না। ন্যায়রত্ন মশাইদের সময়ে, বয়সটা বেশ ভারি। শিক্ষার দিক থেকেও অনেক অগ্রসর। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা-ই, এবং তা ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'একটু মাগুর মাছ খাবার জন্যে তুমি এত কথা বললে, জীবনে আর তা কখনো স্পর্শ করব না। যদি করি, তা হলে সে হবে আমার গোমাংস খাওয়া।'

সেই থেকে আর জীবনে কখনোই মাগুর মাছ স্পর্শ করেননি। পারলে, চোখে না দেখবারও চেষ্টা করতেন। কিন্তু কী বিচিত্র ব্যাপার, যা তাঁর কাছে গোমাংস তুল্য ছিল, তাই মুখে দিয়েই তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল। সেই রাত্রিটাই মাত্র তিনি বেঁচেছিলেন। এবং সারারাত্রি বিসূচিকা রুগীর মত কেবল ওয়াক্ ওয়াক্ করেছেন। যেন তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

তাঁর পুত্রবধূর মুখ থেকেই এ ঘটনা আমি শুনেছিলাম। তিনি হত্যা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি চীৎকার করে কেঁদে তাঁর পা-জোড়া বুকের মধ্যে নিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, "বাবা আমি এ কথা জানতাম না, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। এ মহাপাপের আমার কী গতি হবে, আপনি বলে দিয়ে যান। আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তাই করব।" বাবা আমাকে হাত তুলে আশ্বস্ত করেছিলেন। অনেক কষ্টে বলেছিলেন, "ভবিষ্যৎ তোমার হাত দিয়ে এসেছে মাত্র। তুমি কিছুই করনি। আমি তো অনেকবার বলেছি, গোমাংস খেয়েই আমাকে মরতে হবে। কিন্তু কেমন করে, সেকথা আমার জানা ছিল না। আজ এখন বুঝতে পারছি, ভাগ্যের যা কিছু, তা নিজের কর্ম এবং বাক্য দিয়ে আগেই আমরা তৈরী করে রেখে আসি।" এই কথা বলে, তিনি সারারাত কেবল ভগবানের নাম করেছিলেন, আর বমির মত ওয়াক্ পেড়েছিলেন। বুড়ো মানুষের সেই ওয়াক্ পড়া দেখলে স্থির হয়ে বসে থাকা দায়।'

কবিরাজ মশাইও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ন্যায়রত্নের এ ব্যাপারটা আমারও জানা ছিল, কিন্তু পথ্যি দেবার সময় একেবারে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিলাম।'

তাঁকে ন্যায়রত্ন বলে গিয়েছেন, 'তোমার বিস্মরণের জন্যই ভবিষ্যৎ তার কাজ করেছে, তোমাকে দিয়ে করিয়েছে। এর জন্যে ভাববার কিছু নেই। ব্যবস্থা করবারও কিছু নেই।'

তার পরদিনই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

জানি না, এসব কোন যুক্তিবলে প্রমাণ করব, অথচ ঘটনাকে অস্বীকার করাও অসম্ভব। কারণ তিনি নিজের মুখেই বলেছিলেন, 'নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে তাঁকে মরতে হবে।' একদিক থেকে বিচার করতে গেলে, তিনি নিষিদ্ধ খাদ্যই খেয়েছিলেন। আমরা চিরকালই শুনে এসেছি, বৃন্দাবন ন্যায়রত্ন কখনো মিথ্যাচার করেননি। যা বলতেন, যা করতেন, তা সর্বান্তঃকরণে করতেন। আমি এখন বুঝতে পারি, মাগুর মাছ নিশ্চয়ই গোমাংস নয়, গোমাংসের স্বাদ তার মধ্যে নেই, কিন্তু ন্যায়রত্ন মাগুর মাছের প্রতি এমনই বিরাগ পোষণ করতেন, এমনভাবে তাঁর বিদ্বেষকে ঘৃণায় রূপান্তরিত করেছিলেন, মাগুর মাছ তাঁর কাছে প্রকৃতই গোমাংস হয়ে উঠেছিল। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তা নইলে তিনি অমনভাবে বমনোদ্রেকের নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়া দৈহিক কষ্ট ভোগ করতেন না। মানসিক কষ্টে, ধীরে ধীরে আরো কিছু দিন ধুঁকতে ধুকতে মারা যেতেন।

কিন্তু এসব আমার বক্তব্য নয়। ন্যায়রত্ন মশাইয়ের মধ্যে যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না, অথচ যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছুকে স্বীকার করতেও আমার যুক্তিবাদী মনে আটকায়। কারণ, আমি আমার জীবনে অন্ততঃ এই শিক্ষাই পেয়েছি, সকল কিছুর কার্যকারণের মধ্যেই একটা যুক্তি আছে। যদিও, তুমি আমার রক্তের কথা বলতে পার, আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বংশগতভাবে সেসব বিশ্বাস রক্তধারায় লালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু রক্তপ্রবাহের চিরন্তনতাকে যদি মেনেই নেব, তবে আমার আজকের জীবনের যুক্তিই বা সেখানে কোথায়? এই মন, এই চিন্তা, এই নিশির ঘোর, এই বারোবাসরে বারবধূর শয্যাসঙ্গী, এ সবের চিহ্ন তো সেখানে খুঁজে পাই না। যাকে বলে ট্র্যাডিশনাল, তার কোনো চিহ্নই তো কোথাও খুঁজে পাই না।

যাই হোক, আমার উপনয়নের দ্বিতীয় দিনে, পা টিপে টিপে

বাইরে যাবার সময়ে, আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমি শুনতে পেয়েছিলাম, ন্যায়রত্ন মশাই বাইরের ঘরে বাবাকে বলছেন, 'কিন্তু অরবিন্দের এ ভবিষ্যৎটা আমাকে তো বড় অবাক করছে হে অনঙ্গ।'

আমি তখন ছেলেমানুষ, তবু স্বয়ং ন্যায়রত্ন মশাই, জামাইবাবুর বিষয়ে বলার পর থেকে, ওঁর কথা আমি সহজে ভুলতে পারতাম না। এমনও অনেকদিন হয়েছে, সদ্য বিধবা দিদির দিকে তাকালেই, ন্যায়রত্ন মশাইয়ের সেই টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো তীক্ষ্ণ নাক, দূরবিদ্ধ গভীর তীব্র চোখ, আর প্রায় সর্বক্ষণই বাঁকানো ঠোঁট, রেখাবহুল মুখখানি মনে পড়ে যেত। তাই ওঁর কথাটা শুনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। দরজার পাশ দিয়ে একটু উঠে গিয়ে দেখেছিলাম, একটি পাকানো কোষ্টিপত্র দুজনের মাঝখানে খোলা রয়েছে। একটা আলাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে ন্যায়রত্ন মশাই কী সব লিখেছেন, আর কোষ্টির মধ্যে ছকের ওপর বড় আই-গ্লাস দিয়ে লক্ষ্য করছেন।

দেখছিলাম, বাবার মুখখানি যেন একটা ভয় পাওয়া বিস্ময়ে ন্যায়রত্ন মশাইয়ের ওপর নিবদ্ধ। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়েছিল, বাবার দৃষ্টি দেখে, তিনি যেন কোনো মানুষকে দেখছেন না। যেন কোনো অপদেবতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছু বলতে চাইছেন, তবু বলতে পারছেন না।

আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে এসে, আরো কিছু শোনবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ, তখন কিন্তু আসলে আমি আমার মৃত্যুর কথাই ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম, ন্যায়রত্ন মশাই নিশ্চয়ই আমার মৃত্যুর কথাই বলেছেন। যদিচ, মৃত্যুর কী রূপ, তখন, (বা এখনো) সঠিক বলতে গেলে, কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। এখন মৃত্যু সম্পর্কে অবিশ্যি মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে, যেটা সব থেকে সহজভাবে বলতে গেলে বোঝায়, আমার সকল কিছুর অবসান। এই অবসানের ভিতর দিয়ে, যদি একবার পুঙ্খানুপুঙ্খ এই বিশ্বের দিকে

তাকিয়ে দেখা যায়, আমার প্রত্যহের আবাস-জীবন পরিবেশ কর্মক্ষেত্র পরিচিত মানুষ, তা হলে নিশ্চয়ই একটা ধারণায় আসা যায়, মৃত্যুর মূল রূপটা কী। দৈহিক কষ্ট বা প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া, মৃত্যু মাত্র তা-ই নয়। সে আর কতক্ষণ। তাকে ঠিকমত অনুভব করতে গেলে, মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকেই চিন্তা করতে হবে। যখন আমি আর নেই, অথচ যে পথে আমার পায়ের দাগ পড়েছে প্রতিদিন, সেখানে মৃত্যুর মুহূর্তেই জীবিতের পায়ের ছাপ পড়ছে, যে বাতাসে একটু আগেও আমার নিঃশ্বাস ছিল, সেখানে কোটি কোটি মানুষের নিঃশ্বাস পড়ছে। এমনকি, এই যে মেয়েটি এখনো ভুরু বাঁকিয়ে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন আমাকে বুঝতে চাইছে, যার দেহে আমি উপগত হয়েছিলাম কিছুপূর্বেই, আজ ফিরে গিয়ে আমার মৃত্যু হলে, আগামীকালই অন্য কোনো জীবিত এসে এই দেহে আরোহণ করবে।

এই তো মৃত্যু। পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষ। এর সঙ্গে যদি বিবিধ আদর্শকে টেনে আন, তা হলে আমার কিছু বলবার নেই, যেমন ইতিহাসের অবিনশ্বরতা, কর্মের স্মৃতি। এগুলো ইডিওলজির কথা হয়ে যায়। ব্যক্তির আপন সত্তার কাছে মৃত্যু-চিন্তার কথাই আমি বলছি। সে জানে, তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির সকল জগত সেখানেই শেষ। নিঃশেষ।

যদিচ, এই চিন্তার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে, মৃত্যু-ভাবনা আমাকে মোটেই এখন বিচলিত করে না। কথাটা তোমার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হলো কি না আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমাকে, আমার নিজের দিক থেকে, আমি কোনো অসত্য ভাষণ করব না। শ্মশানে বসে শব-সাধনার মতই বেশ্যালয়ে বসেই আমি তোমাকে আমার কথা লিখে চলেছি। কেন আমাকে বিচলিত করে না, তার দু-একটা যুক্তি থাকতে পারে। না, যুক্তি বলা যাবে না তাকে। যেমন ধর, আমার নিজেকে এক এক সময় মনে হয়, আমি বৃন্তহীন ভাসমান জীব। কখনো মনে হয়, একটা অপরিচিত ভূমিখণ্ডে আমার শিকড় গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, যাকে আমি প্রতিমুহূর্তেই

ছিঁড়তে চাইছি, উপড়ে ফেলতে চাইছি। এ দুয়ের মাঝখানে, এই দুই ভাবনার মাঝখানে মৃত্যু-চিন্তা আমাকে কখনোই বিচলিত করতে পারে না।

বরং, হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করতে পার, নিজের প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা থাকা সত্ত্বেও, জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে আমি এখন অনেকটা উদাসীন। উদাসীন কথাটা দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারছি না বলেই, ইংরেজীতে বলতে হয়, ক্যালাস্। ইদানিং, নিজেও নানাভাবে নিজেকে লক্ষ্য করে দেখেছি, আমার ঠোঁট জোড়া প্রায়ই উল্টে থাকে। অনেকটা বিদ্রূপের ধরনেই বলতে পার। আর সেই বিদ্রূপ করাটা, বাইরের জগতকে নয়। সমাজ বা মানুষকে নয়। নিজের জীবনকেই। যেন আমি নিজেকেই বলতে চাইছি, 'অরবিন্দ চক্রবর্তী, তোমাকে চেনা আছে। এখন আর তোমাকে চিনতে কোনো অসুবিধে নেই।'

তা হলে, এই মেয়েটির শেষদিকের কথোপকথনের কথাগুলো তোমাকে বলে নিই, কেননা, ও যেন আমার বিষয়েই প্রায় একটা রূঢ় নিষ্ঠুর সত্য কথা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়েই বলছিল। ও আমাকে বলছিল, বিয়ের বিষয়ে বলবার সময়েই বলছিল, 'তা হলে, ঘরে ঘরে না ঘুরে, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেই তো পারেন। বয়স তো হলো।'

কথাটা লাগবার মতই। যদিও, বয়সের কথাটা যে কারণে আসে, যৌবন গত হয়ে যাওয়া, বার্ধক্যে অসহায় হয়ে পড়া, এসব চিন্তা আমাকে কখনোই কাবু করে না। আমি বিশ্বে কাউকে আমার যৌবন দিয়ে সুখী করতে আসিনি, নিজেই একটা অভিশপ্ত ঘোরে চিরকাল ঘুরে বেড়িয়ে গেলাম, এবং সত্যি জানি না, নিজেকেও কখনো সুখী করতে পেরেছি কি না। বারোবাসরের দরজায় দরজায় এত যে মাথা কুটে মরলাম সারাটা জীবন, তাতে কী সুখ আহরণ করেছি, সত্যি জানি না।

কিন্তু আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম, 'আমার থেকে অনেক বুড়ো

বয়সের লোককেও তো এ সব জায়গায় যাতায়াত করতে দেখি।'

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিল, 'ওদের কথা ছেড়ে দিন। গু-খাওয়া শুয়োর বুড়ো হলেও বাঁদাড় না ঘেঁটে পারে না, যতই ভাত দাও আর ফ্যান দাও। আপনাকে দেখে সে রকম মনে হয় না, তাই বললাম।'

আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি যেন আমার সম্পর্কেই খাঁটি কথাটি বলেছিল। সেই বয়স্ক বুড়োরা যদি-বা কোনোদিন ফিরে যেতে পারে, আমার মৃত্যু হয়তো এদেরই কারুর ঘরে হবে। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। একটু অবিশ্যি অবাকই লাগছিল, মেয়েটি নিজেদের সম্পর্কেই বা এতটা রূঢ় হয় কেমন করে? এ কি নিজেদেরই বিষ্ঠা মনে করা, নাকি শুধু উক্ত লোকগুলোর প্রতিই তার বিদ্বেষের ভাষা এটা, জানি না।

কিন্তু আমার ঠোঁট যখন উল্টে থাকে বিদ্রূপে, পাশের রেখায় থাকে বক্রতা, তখন বুঝতে পারি, ওই মেয়েটি যেমনভাবে বলছিল, আমার নিজের প্রতি একটা সেরকমই ভাব। আমি চিনে নিয়েছি। বুঝে নিয়েছি।

কিন্তু থাক এসব কথা! যা বলছিলাম, আমি বাইরের ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে চাইছিলাম, আর ওঁর আগের কথাটা শুনে মৃত্যুর কথাই প্রথমে আমার মনে হয়েছিল। মৃত্যু মানেই ভয়, এবং সে রকম একটা ভয় ছিল বলেই, আমি দাঁড়িয়ে শুনতে চাইছিলাম।

একটু পরে বাবার গলা শোনা গিয়েছিল, 'কিন্তু ন্যায়রত্ন মশাই, এ তো সত্যি নাও হতে পারে।'

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের গলায় কেবল একটি প্রশ্নবোধক হুংকার শোনা গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ কিছু বলেননি। একটু পরে বলেছিলেন, 'সত্যি না হলে, আমিই তো সব থেকে বেশী সুখী হব। তবে,

আমি যা দেখছি, এর মধ্যে একটা বিচারের প্রশ্ন আছে।'

বাবার উৎসুক গলা শোনা গিয়েছিল, 'কী রকম ?'

ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, 'এখন দেখা দরকার, উর্ধ্বে না অধঃ, কোন জগতে তোমার ছেলে পরিক্রমণ করবে। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, দগ্ধশুক্র জাতকের উর্ধ্বরেতঃ হওয়া উচিত। ব্রহ্মচারী, নিষ্কলুষ পবিত্র পুরুষ। তাঁর সকল প্রেমের মধ্যেই, দেহের কোনো আশ্রয় নেই। কিন্তু—।'

তাঁর গলার স্বর থেমে গিয়েছিল। বাবার গলা আবার শোনা গিয়েছিল, 'কিন্তু কী ? আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, অরবিন্দের পক্ষে সেটাই তো সম্ভব। আপনি তো ওকে দেখেছেন। আপনি নিজেই বলছেন, এ ছেলে মেধাবী হবে, সম্ভবতঃ শিক্ষাদানই হবে এর জীবিকা, এবং সেজন্য অর্থ ও যশ-ভাগ্যও বেশ ভাল। এসব কথার সঙ্গে আপনার এই বিচারই তো ঠিক মিলে যায় বলে আমার মনে হচ্ছে।'

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের দৃঢ় গলা শোনা গিয়েছিল, 'না, মেলে না। তোমার পুত্রের শুক্রস্থানের সঙ্গে, রবির থেকেও রাহুর যোগটাই বেশী রয়েছে কিনা, সেই জন্যেই ভাবনা। পরনারী গমন প্রায় স্থিরনিশ্চিত দেখছি আমি।'

আজ আমি এখন তোমাকে কথাগুলো যেভাবে লিখতে পারছি, তখন কিন্তু আমি সে সবের কোনো অর্থই বুঝতে পারিনি। শুক্র রবি রাহু, এ সবের সঙ্গে জীবনের কী যোগাযোগ আছে, কিছুই বুঝতে পারিনি। শুক্র রবি, একমাত্র সপ্তাহের দুটি বারের নাম, এ ছাড়া কোনো অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। তবে সূর্যকে রবি বলে, বা শুক্র নামে একটি গ্রহ আছে, এ সব কথা তখনই আমার বইয়ে পড়া হয়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে, শরতে বা গ্রীষ্মের রাত্রে বসে, অনেক গ্রহ নক্ষত্রই তখন আমি চিনে নিয়েছিলাম। অনেকদিন, একলা উঠোনে বা ছাদে শুয়ে শুয়ে, সেই সব গ্রহ নক্ষত্রদের নিয়ে বহু কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছি। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেরই কিছু কিছু

কাহিনী, যা মহাভারত বা রামায়ণে লেখা ছিল, সব জেনে নিয়েছিলাম। সেজন্যে গ্রহ নক্ষত্রেরা কেউ-ই আমার কাছে কতগুলো, কালো আকাশের পটে, ঝকঝকে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁদের সকলেরই জীবনবৃত্তান্ত ছিল। আশ্চর্যজনক উত্থান-পতনের নায়ক এবং নায়িকা তাঁরা।

কিন্তু, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, তাঁদের কার কী করণীয়, তা আমার কিছুই জানা ছিল না। এবং যে বিষয়ে ন্যায়রত্ন স্থিরনিশ্চিত ছিলেন, ‘পরনারী গমন’, তার বিন্দুবিসর্গও আমি তখন বুঝতে পারিনি। যদিও কথাটা অনেকক্ষণ পর্যন্তই আমার মনে হয়েছিল।

একটু পরে আবার ন্যায়রত্ন মশাইয়ের গলাই শোনা গিয়েছিল, ‘কী আশ্চর্য, অনঙ্গ, তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন? অরবিন্দ তো পুরুষমানুষ, সে তো তোমার মেয়ে নয়। পুরুষের জীবনে, আমি মনে করি না, এটা একটা খুব অভাবিত ব্যাপার।’

বাবার গলা শোনা গিয়েছিল, ‘এ যে আপনি আমগাছে আমড়া জন্মাবার কথা বললেন ন্যায়রত্ন মশাই?’

‘আমি কিছুই বলিনি অনঙ্গ। এটা একটা শাস্ত্রমতের সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রমতই বা কেন, যদি আমি ঠিক দেখে থাকি, তাহলে অরবিন্দের ভাগ্যেরই সিদ্ধান্ত।’

বাবা বলে উঠেছিলেন, ‘কিন্তু বংশের কথাটা কি একটুও ভাববার নেই?’

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের গলা শোনা গিয়েছিল, ‘ও কথা বলে কোনো লাভ নেই অনঙ্গ। ধৃতরাষ্ট্র কোনো পরনারীর বস্ত্রাবরণ টেনে খোলেননি, কিন্তু দুর্যোধন খুলেছিলেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এমন সহস্র প্রমাণ তুমি পাবে, বংশগত পরিচয়ের মধ্যে যার কোনো হদিস পাওয়া যাবে না। সেই হিসেবে বরং প্রতিটি মানুষকেই তুমি একটি অনিত্যকালের গ্রহ বলতে পার। সে নিতান্তই একক। তুমি তোমার জীবনে যা দেখছ, সব কি তাই? পরিবর্তন কি হয় না?’

'তার তো কোনো কারণ থাকে ন্যায়রত্ন মশাই ?'

'থাকে। সেই কারণ তখনই সৃষ্টি হবে, যখন জাতক সেই কর্মে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কেন, সেকথা পূর্বে জানাটা বড় কথা নয়, দুষ্মন্তের সেই মুহূর্তের মুগ্ধ আত্মার কথা চিন্তা কর।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে বাবার গলা শোনা গিয়েছিল, 'কিছুই কি করবার নেই ন্যায়রত্ন মশাই ?'

ন্যায়রত্ন মশাই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপরে বলেছিলেন, 'দেখ অনঙ্গ, তুমি যে এত চিন্তিত হচ্ছ, তার কোনো কারণ দেখি না আমি। ও এখনো ছোট। যৌবনকাল আসতে দেরী আছে। তোমায় জীবিতকালে হয়তো কিছুই দেখে যেতে হবে না।'

বাবা বলছিলেন, 'জীবিতকালের কথাই কি সব ন্যায়রত্ন মশাই ? যে কথা আজ আপনি শোনালেন, তাতে মরেও যে শান্তি পাব না। আমার তো এখনই মনে হচ্ছে, ভয়ংকর অপমান যন্ত্রণা যেন আমার গায়ে আগুন ছিটিয়ে দিচ্ছে।'

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের গলা শোনা গিয়েছিল, 'সে রকম কথা তো তোমাকে আমি বলিনি। এমন কথা তোমাকে একবারও বলিনি, সমস্ত ব্যাপারটা জগতময় ছড়িয়ে যাবে। বরং তোমাকে একথাই বলেছি, সমস্ত জীবনটাই একটা অন্ধকারের মধ্যে গোপনেই কেটে যাবে। কারণ পরনারী গমন বলতে এক্ষেত্রে আমি বলতে চেয়েছি, বেশ্যাসক্ত হওয়ার কথা।...ও কি, না না না, অনঙ্গ, অতটা ভেঙে পড়লে তো চলবে না। তাহলে তুমি আমাকে সব কথা বলতে বললে কেন ? তোমাকে তো আগেই বলেছি, সব কথা শোনবার দরকার কী। ভবিষ্যতের সব কথা না জানতে চাওয়াই উচিত। তুমি জোর করলে, শুনবার জন্যে জেদ করলে, তাই আমি বলেছি। এখন দেখছি, তোমাকে কিছু শোনানো আমার উচিত হয়নি।'

আমি স্থির থাকতে পারিনি, আবার উঁকি মেরে দেখেছিলাম, বাবা কী করছেন। দেখেছিলাম, বাবা মাথায় হাত দিয়ে, মুখ

নিচু করে বসে আছেন। ন্যায়রত্ন মশাই ভ্রূকুটি করে বাবার দিকে তাকিয়েছিলেন। এমনকি, আমার এ সন্দেহও হয়েছিল, বাবা কাঁদছেন।

আমার মনের মধ্যে তখন একটা কথা ঘোরাফেরা করছিল। 'বেশ্যাসক্ত' হওয়ার বিষয়ে কী বলছিলেন ন্যায়রত্ন মশাই। পরনারী গমনের মত, বেশ্যা শব্দটা আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। শত হলেও, আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, ক্লাস এইট যাকে বলে। কিন্তু আমার বিষয় আলোচনার মধ্যে বেশ্যাসক্ত শব্দটা কোনদিক থেকে আসতে পারে, বুঝতে পারছিলাম না। একবার চকিতের জন্যে মনে হয়েছিল, আমি বেশ্যাবাড়ি যাব, এরকম কথা ন্যায়রত্ন বলছেন নাকি? ভাবতেই, আমার তৎকালীন কিশোর ব্রহ্মচারী মনটা যেন অপবিত্রতায় শিউরে উঠেছিল, একটা ভয়ংকর লজ্জায় নিজেই নিজের কাছে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। বলে উঠেছিলাম, 'ছিঃ এসব কথা যে ভাবতেও নেই। তা আবার কখনো হতে পারে নাকি?'

কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা যেন কেমন একরকম হয়ে উঠেছিল। আমার মনটা স্বভাবতই বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

বাবার গলা আবার শোনা গিয়েছিল, 'অন্য কেউ কিছু বললে আমি ভাবতাম না। কিন্তু ন্যায়রত্ন মশাই, আপনি যে সিদ্ধবাক্। আপনার কথা তো কখনো ভুল হয় না।'

'সেটা আমারই দুর্ভাগ্য অনঙ্গ। তার ওপরে লোকে বলে, আমার মন্দ কথাই সব ফলে যায়। সেজন্যে কাউকে আর কিছু আমার বলতে ইচ্ছে করে না। এমনকি নিজেকেও না। তা নইলে, তুমি এটা বোঝ না, আমার মুখে গোমাংস যাবে, তবে আমার মৃত্যু হবে, একথা কি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি?'

সেই আমি প্রথম ন্যায়রত্ন মশাইয়ের নিজের মুখে গোমাংসের কথা শুনেছিলাম। বাবাও তাই শুনেছিলেন, এবং অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সে কি কথা? এ যে মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারি না।'

'বিশ্বাস আমিও করতে চাই না অনঙ্গ। কারণ সব কিছুর যোগসূত্রটা তো আমিও খুঁজে পাই না। ওই কারণেই তোমাকে আমি বংশের কথাটা বলছিলাম। ওটা দিয়ে কিছু বিচার হয় না। কিন্তু ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যদি ভাগ্যে থাকে হবে, কী করব?'

বাবা বলেছিলেন, 'ভাগ্যে থাকলেও, ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ও তো আছে। সেরকম কিছু করা যায় না?'

'তুমি তো জান, ব্যবস্থাবলম্বনে আমি বিশ্বাস করি না। তবে, আমরা একটা কথা তো বলে থাকি, সাবধানের মার নেই। যার চেতনা যত সজাগ, তার ক্ষতি তত কম হয়, এ তো পরিষ্কার কথা। নইলে আর জাগ্রত চেতনার কথাটা এসেছে কেন?'

বাবা বলে উঠেছিলেন, 'আমি যদি এখন থেকে ওকে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি, তা হলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল কথা। এর দুটি পরিণতি হতে পারে। এক, সংশয়ের দ্বারা অরবিন্দ সর্বক্ষণ পীড়িত হতে পারে, নিজের কর্মের জন্যে অনুশোচনাবোধ বেড়ে উঠতে পারে। আবার বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে, বর্ষার পর্বতের মত ধ্বসে যেতে পারে। তবু ভাল, ভাল সব সময়েই ভাল।'

উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম, ন্যায়রত্ন মশাই কোষ্ঠিপত্র গোটাচ্ছেন। আমি চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলাম। আবার তাঁর গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'তবে এটাও ঠিক, একটা ঘোর পরিবর্তনও হবে, যখন অনেক উঁচুতে উঠবে ও। তখন ও ঊর্ধ্বরেতঃ ব্রহ্মচারী বলতে যা বোঝায়, তাই হয়ে উঠবে। সেই জীবনটা ওর খুব সুখের। তখন ও ওর পাপকাহিনী ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করবে না। এই জন্যেই দ্বিধা করবে না, ওর কাছে তার মূল্য অনেকটা স্বপ্নের মত। স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাওয়ার মত মনে হবে সব কথা। তখন কত মেয়েই যাবে আসবে ওর কাছে, ওকে দেখে তারা ভক্তি করবে, আত্মদান করতে চাইবে, ওর কিছুই যাবে আসবে না।

একবার যে ধারা গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, আকাশের তলায় আলোয় ছোটে, তখন কি আর তাকে ধরে রাখা যায়? মন তুমি একেবারেই খারাপ করো না অনঙ্গ।'

আমি তাড়াতাড়ি আমার বন্দী ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। বাইরে পালানো আর সম্ভব হয়নি। আমার ইচ্ছেও ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা আমি ভাবতে চাইছিলাম। যদিও সত্যি ভাববার মত পরিণত মন আমার ছিল না। কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের মধ্যে সেই দিনটি, তারপরে বহুবার মনে পড়েছে।

সাহিত্যিক, জানি না, তোমাকে সব কথা ব্যক্ত করার মধ্য দিয়েই, ন্যায়রত্ন মশাইয়ের ভবিষ্যৎবাণী ফলতে শুরু করল কি না। তবে এটা ঠিক, তখন যেসব কথা শুনেছিলাম, নিজের জীবনে আমাকে তা সত্যিই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আজ যে তোমাকে ব্যক্ত করছি, তাতেও একটা পরম শান্তি বোধ করছি। যদিও সত্যি ঠিক স্বপ্নের মতই আমার কিছু মনে হচ্ছে না, বা আমি কোনো ঘোরের বাইরে এসে, নতুন করে কিছুই দেখছি না। বিশেষ, যেখানে বসে এসব কথা লিখছি, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যায়, সেই অবস্থা আমার কখনোই আসবে না। তবে একটা কথা বোধ করছি, তোমাকে আগেই যেখানে লিখেছি, আমার এই জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে যেন আমার নামটা কখনো প্রকাশিত না হয়, এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে, ক্ষতি কী। যা কিছু ঘটেছে, তা আমার জীবনেই ঘটেছে। যদি লোকে আমার কলঙ্ক গায়, তা নিতান্ত আমারই কলঙ্ক বলে গণ্য হবে। আমি আমার সারা জীবনে কখনো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি। যা করেছি, তা নিজেরই করেছি। আমার সঙ্গে কেউ জড়িয়ে নেই।

অতএব, সাহিত্যিক, গোপনীয়তার হাত থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। যদি তোমার কখনো মনে হয়, আমার বিষয় তোমার

কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে, তা হলে তুমি বলো। অনুরোধ কেবল একটি রইল, সত্যি কথা বলো। আমি যা বলেছি, সেই সত্যকে উজ্জ্বল করার জন্যে যদি তোমার কল্পনার রং দিতে ইচ্ছে করে, দিও। সত্য আর বাস্তবে তো সেখানেই তফাৎ, নয় কি? সত্যকে কল্পনার তুলি দিয়েই বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়। তা নইলে, সত্যও অনেক সময় মিথ্যার রূপ ধরে উপস্থিত হয়।

কিন্তু, তোমাকে জীবনবৃত্তান্তই বলি, কচকচি থাক। যেদিন ন্যায়রত্ন মশাইয়ের মুখে ওসব কথা শুনলাম, সেদিন আমি আমার বন্দী ঘরটায় বসে অনেক কথা চিন্তা করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, একটা অস্পষ্ট ভয় এবং অস্বস্তি আমার মধ্যে কাজ করছিল। তখন আমি ছোট ছিলাম সত্যি, কিন্তু এমন ছোট ছিলাম না যে, কতগুলো অস্পষ্ট ধারণা তৈরী করে নিতে পারি না। আমার জন্যে বাবার দুশ্চিন্তা, বংশের সুনাম সম্পর্কে ভয়, পরনারী (যার মানে সত্যি তখন বুঝতাম না) গমন, বেশ্যাসক্ত, সব কিছুই যেন আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল। অনেকটা অজানা ভয় এক এক সময় অর্থহীনভাবে উপস্থিত হয়ে যেমন বিমর্ষ ও ভীত করে তোলে, সেইরকম।

ন্যায়রত্ন মশাই সেদিনই, খাওয়া দাওয়া সেরে, বিকেলের গাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে, আমি যে ঘরে ছিলাম, তিনি সেই ঘরে এসেছিলেন। তখন আমার কাউকে প্রণাম করতে নেই। আমি ভুলে গিয়ে, ওঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম। উনি বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বোস, পায়ে হাত দিস না। তুই তো এখন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী।'

আমি চুপ করে বসেছিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'ছাখ অরবিন্দ, জীবনটা হচ্ছে নদীর মত, জানিস তো। সে কখনই সোজা চলে না।

আঁকাবাঁকা তার গতি। সে বেগে বয়ে যাবে, এই হল নিয়ম। থেমে গেল তো নদীই মরে গেল। কিন্তু নদী যখন চলে, সে কোনো কিছুই মানে না। তোদের শহরের ধারে গঙ্গাতে দেখেছিস তো, জল কখনো ঘোলা, কখনো টলটলে পরিষ্কার। আবার কখনো নদী গ্রাম ঘর দোর ভেঙে নিয়েও চলে যায়, তার জন্যে সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। তার কোনো আক্ষেপ নেই। খুব বেগে চলবি। যাকগে এঁকেবেঁকে, সে ঠিক তার জায়গায় যাবে। তুই স্বচ্ছন্দে চলবি, তা হলেই সব ঠিক।'

আরো অনেক কথাই বলেছিলেন। যে কথাগুলো এখন বললাম, ঠিক এসব কথাই যে সেদিন তিনি বলেছিলেন, তাও ঠিক নয়। এই ভাবের কথাগুলো। যার থেকে আমি এখন তার অর্থ করে নিয়েছি, জীবন সোজা পথ বেয়ে চলে না। তার গতি বঙ্কিম, কিন্তু আমি যেন তা দেখে, কখনো ভয়ে বা দ্বিধায় থমকে না যাই। আমি আমার গতিপথ ধরেই চলব, যা আসে সামনে, তাই গ্রহণ করব।

সম্ভবতঃ এর থেকে ভাগ্যবাদী চিন্তা আর কোনো কিছুকেই বলা যায় না। তবু ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কথাগুলো, জীবনে আমি প্রায় কখনোই ভুলিনি। যদিও নদীর ইচ্ছা বলে কোনো বস্তু নেই, কিন্তু মানুষের আছে। তাই জীবনে যখনই কোনো বাঁকের মুখে এসেছি, আবর্তিত হয়ে উঠেছি, অর্থাৎ যাকে বলে ছটফট করে মরেছি, তখনই বুঝতে পেরেছি, বেগ চাই, বেগ চাই। এবং অস্বীকার করতে পারব না, বেগ ছিল সত্যি আমার জীবনে, কিন্তু কোনো ছন্দ ছিল না। আসলে ন্যায়রত্ন মশাই বোধহয় একটা কথা বুঝেছিলেন, যাতনাদায়ক মুহূর্তগুলোতে আমি এমন দিশেহারা হয়ে পড়তে পারি, যখন আত্মহত্যার প্রবণতা আমার মধ্যে দেখা দিতে পারে, আর সে প্রবণতা আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবেই ছিল। আত্মনাশের চিন্তা এক একবার আমাকে এমন ভীষণ ভাবে আক্রমণ করেছে, এখন মাঝে মাঝে ভাবি, কী ভাবে আমি তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। সে হিসেবে, একমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই, ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কথা

জীবনে কাজে লেগেছিল। দুঃসহ বিতৃষ্ণা জীবন সম্পর্কে এত প্রকট হয়ে উঠেছে কোনো কোনো সময়, যখন নিজেকে বিদ্রূপ করেছি, ধিক্কার দিয়েছি, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চেয়েছি। এমন সময়ও এসেছে, যখন নিজেকে পশু বলেই জ্ঞান করেছি, এবং সেই জ্ঞান করাটা আমার আজও ঘোচেনি।

কিন্তু, এসব কথা থাক। তোমাকে ঘটনার কথাই বলি। যেদিন ন্যায়রত্ন মশাই চলে গিয়েছিলেন, তারপর বাবা আমাকে নিয়ে পড়েছিলেন। কত কথা যে সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কত রকমের উপদেশ দিয়েছিলেন! বাবা যে কী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর একটার পর একটা বিষয়ের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। জীবন কী, জীবনের উদ্দেশ্য কী, মানুষের বেঁচে থাকার মানবিক প্রয়োজন কি, ইত্যাদি নানান বিষয়ে রামায়ণ মহাভারত থেকে ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ করে তিনি আমাকে বলেছিলেন। তখন সন্ত উপনয়ন হয়েছে, তাই ওঁর পক্ষে আমাকে নানান উপদেশ দেবার যুক্তিও ছিল। তিনি তো জানতেন না, আমি আড়ি পেতে সব কথাই শুনেছি। কেন যে এত কথা বলছিলেন, আমি যে তা বুঝতে পারছিলাম, তা উনি জানতেন না। আর সেজন্যেই আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি আমাকে যত কথা বলছিলেন, তার অধিকাংশই সততা, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য বিষয়ক ছিল।

আমার মা এবং দিদি বরং একটু অবাকই হয়েছিলেন, এত দীর্ঘ সময় ধরে বাবাকে উপদেশ দিতে ও গল্প বলতে দেখে। মায়ের চোখে আমি কৌতূহলিত চিন্তার ছায়া দেখেছিলাম, যখন তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে জানতেন, মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারতেন। তিনি অনুমান করেছিলেন, নিশ্চয় বাবার মনের মধ্যে কিছু একটা আন্দোলন চলছে, তাই এত কথা বলছেন। যে কারণে মা আমার দিকেও অনুসন্ধিৎসু চোখে বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন, আমি

কোনো অপরাধ করেছি কি না, যার জন্যে বাবাকে আমার সঙ্গে এত কথা বলতে হচ্ছিল। কারণ, কোনো বিষয়ে অন্যায় করলে, বাবার নিয়ম ছিল, তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে বোঝাতেন, শুধু বোঝানো নয়, তার মধ্যে বকুনি, ধমকানি, উপদেশ সবই থাকত।

তারপরে নিশ্চয় তিনি মাকে সব কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন, উপনয়নের দ্বিতীয় দিনে, বাবা মন্দিরের রকে ওঁর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে না গিয়েও আমার কাছেই সন্ধ্যাবেলা বসেছিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকের নানান রীতি পদ্ধতি, পূজার নিয়ম-কানুন বিষয়ে অনেক কথা তখন বলেছিলেন। এবং সেই দিন থেকে, বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন, কেবল চেষ্টা করেছেন, কী ভাবে আমাকে তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী করে গড়ে তুলবেন। বয়ঃসন্ধিক্ষণে, বাবা আমাকে শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ে খুব খোলাখুলি ভাবেই উপদেশ দিতেন। যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম, ইত্যাদি বিষয়েও তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। সব কিছুর মূলেই তাঁর সেই এক ভয়, আমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। তাই, তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন, আমি যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করি, তাতেও শান্তি পাবেন, তবু যেন ন্যায়রত্ন মশাইয়ের ভবিতব্যের শিকার না হই। এমনকি, আঠারো বছর বয়সে তিনি আমাকে বিয়ে দেবারও উদ্যোগ করেছিলেন, ভেবেছিলেন, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী যদি না হই, ঘোরতররূপে যেন গৃহী হয়ে উঠি। কল্পনা করেছিলেন, তখনই যদি আমার বিয়ে দিয়ে দেন, তা হলে ভবিষ্যতে আমার রাহুগ্রস্ত শুক্রের অনাচার থেকে হয়তো রেহাই পেয়ে যাব। হয়তো আমি স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে আর অনাচারের পথে পা বাড়াব না।

সাহিত্যিক, সত্যি বলতে কি, এখন আমার মনে হয়, বাবা যদি তাই করতেন, আজ বোধহয়, আমার প্রত্যাবর্তনের একটা সম্ভাবনা থাকত। কিম্বা, সত্যি হয়তো আমি, আমার অপ্রতিরোধ্য ভাগ্যের

বিরুদ্ধে জীবনযাত্রা শুরু করতে পারতাম, যা আমাকে কোনোরকমেই এই বর্তমানের অন্ধকারে এনে ফেলতে পারত না।

কিন্তু মা কাকা জ্যাঠা, সবাই আপত্তি করেছিলেন। তখন আমি বি-এস-সি-অনার্স পড়ছি। আমার নিজের কাছেও ব্যাপারটা খুব হাস্যকব বলে বোধ হয়েছিল। আমার কলেজের এবং পাড়ার বন্ধুবান্ধবেরা এই নিয়ে কয়েকদিন খুব হাসিঠাট্টাও করেছিল। তবে তখন আমি আমার ভবিতব্যের কথা মোটামুটিভাবে জেনেছিলাম। বাবাই আমাকে জানিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে আমি সব সময়েই সচেতন থাকতে পারি।

অথচ সত্যি বলতে কি, সচেতন থাকবাব কোনো প্রশ্নই ছিল না, কারণ ওসব কথা আমার কখনো ঘুণাক্ষবে মনেও পড়ত না। বোধহয়, সেটাই মারাত্মক হয়েছিল। ঘুণাক্ষবেও মনে না পড়াব মানে যে, অবচেতনের মধ্যে ক্রমেই সে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, একটা মূর্তি তৈরী করছিল, তখন জানতাম না। তাই, মনে পড়লেই ছিল ভাল। তাতে হয়তো সত্যি আমি সচেতন থাকতে পারতাম। যদিও সম্ভব ছিল কিনা, জানি না।

আমি এম-এস-সি পাশ করার আগেই বাবা মাবা গিয়েছিলেন। জানি, বাবা মরবার সময়ে, একটি মাত্র অশান্তি নিয়েই মারা গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারি পুত্রস্নেহেব থেকেও, পুত্রের জীবনের শুচিতা পবিত্রতার মূল্যই তাঁর কাছে বেশী ছিল। আমি কখনো কখনো বাবাকে, অপরের সঙ্গে, বা মায়ের সঙ্গে, কথায় কথায় বলতে শুনেছি, 'দুশ্চরিত্র লম্পট সন্তান যদি কারুর থাকে, তবে সে সন্তানের মৃত্যু হওয়াই ভাল।'

এখন ভাবি, কেন আমার মৃত্যু হয়নি। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, বাবা নিশ্চয় আমার মৃত্যুকামনাও করেছিলেন। তিনি ঠিকই করেছিলেন। আমি অমন বাবার ছেলে হয়েও, কী করে এখানে এসে বসে আছি, কেমন করে এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ! আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা তখনই প্রবল হয়েছে, যখন বাবার ওই কথা আমার

মনে পড়েছে। বাবা, এমনকি আমার মৃত্যুকামনা পর্যন্ত করেছিলেন, একথা ভাবলেই আত্মনাশের ইচ্ছা ভয়ংকর হয়ে উঠত। তবু, শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্যে, আমি আবার বেঁচে থাকতাম। মনে করতাম, দেখি, আমি নিজের সঙ্গে লড়ে জিততে পারি কিনা।

ওটা একরকমভাবে নিজেকেই করুণা করা, বিদ্রূপ করা। এই মেয়েটির ভাষায়, সেই বিষ্টাভোজী শুয়োরের মত, অচেতনের আত্মনাশেব অবিকার বোধ পর্যন্ত চলে যায়।

বাবা মারা যাবাব পরে, আমি এম-এস-সি পাশ করেছিলাম। তখন থেকেই তোমাদের ইস্কুলে, অর্থাৎ আমি নিজে যে ইস্কুলে পড়েছি, সে হিসেবে আমাদের ইস্কুল বলাই ভাল, আমাদের ইস্কুলে মাঝে মধ্যে পড়াতে যেতাম। আমাদের ছোট শহরে, পাড়ায়, সর্বত্রই আমাব খুব সুনাম ছিল, সে কথা আজ আর তোমাকে না বললেও চলে। আজও কিন্তু আমাব সেই সুনাম সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই আছে। তাই আমাকে, ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই ডেকে বলেছিলেন, 'অরবিন্দ, তুমি মাঝে মাঝে এসে ছেলেদের পড়িয়ে যেও। এখন থেকেই মহড়া চলতে থাকুক, কারণ আমি বা ইস্কুলের কর্তারা সবাই চান, এ ইস্কুলেব দায়িত্ব ভবিষ্যতে তুমিই নেবে।'

আমার জীবনের উদ্দেশ্য ইস্কুলমাস্টার হওয়া ছিল না, তবু আমাদের এখনকার ছোট শহরকে তখনো গ্রামই বলতে হবে, এবং গ্রামের লোকের স্নেহ ও ইচ্ছা অবহেলা করার মনোভাব আমার ছিল না। আমি তাই যেতাম পড়াতে। পাশ করার পর, পুরোপুরি মাস্টারি আমাকে নিতে হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে তখন আমার রীতিমত পরিচয়।

আর্থিক খাবাপ অবস্থার জন্যে যে আমাকে পাশ করার পরেই ইস্কুলে মাস্টাবি নিতে হয়েছিল, তা নয়। চাকরি না করলেও, পারিবারিক সম্পত্তিতে, আমাদের মা ও দিদিকে নিয়ে তিনটি প্রাণীর জীবনটা কেটে যেতে পারত। কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়। মানুষ চিরকালই কিছু করতে চেয়েছে।…

আজ এখানেই ইতি। চারটে বাজল, এবার আমি ফিরব। দেখছি, মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডেকে আমি বিদায় নেব। আবার আগামী কাল রাত্রে, জানি না আমি কোথায় থাকব। যেখানেই থাকি এই বৃত্তান্ত লেখার কাজ আমি চালিয়ে যাব। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ আমি আমার ঘরে বসেই লিখছি। রাত্রিও তেমন বেশী হয়নি। নিশির ডাকটা যে আমার রক্তের শিরায় শিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা টের পাচ্ছি। না, আমি জোর করে নিজেকে ধরে রাখিনি। সে তেমন করে ডাকলে, আমাকে উঠতেই হবে, আমি জানি। কিন্তু দেখছি ওর ডাকের মধ্যে সেই ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার তীব্রতা নেই। বোধ হয় এই কারণে আজ টিউটোরিয়াল শেষ করে বাড়ি ফিরে হঠাৎ বাড়ির পুরনো ফটোগুলো দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। দেখতে দেখতে এত কথা মনে হচ্ছিল, নিশির ডাকটা সেখানে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না।

মা-বাবা, কাকা-জ্যাঠা, তাঁদের ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ আমার ভাই বোন, দিদি এবং জামাইবাবু, এমন কি ঠাকুর্দা, আর ন্যায়রত্ন মশাইয়ের ফটোও ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ফটোগুলো আজ দেখেছি। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সব সুখ দুঃখের কথা তোমাকে বলব না, বৃত্তান্ত অকারণ দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

সাহিত্যিক, আজ আমি তোমাকে, আমার জীবনের একটি 'প্রথম দিনের' কাহিনী শোনাব। নারী কিংবা পুরুষ, যা-ই হোক, জীবনের যে 'প্রথম দিনটি'র কথা বহুবার বহুরকম ভাবে ভেবেছি, যে প্রথম দিনটি সারা জীবনে, আমৃত্যু অক্ষয় হয়ে থাকে, সেই প্রথম দিনের কথাই তোমাকে আজ বলি। অবিশ্যি একটা বিষয় খুব আশ্চর্য, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, আমি কিন্তু এই ধরনের 'প্রথম দিন' সম্পর্কে সত্যি আগে থেকে কোনো কল্পনা গড়ে তুলিনি বা আমার

সে কথা তেমন করে কখনো মনে হয়নি। সে কারণে, প্রিয়ংবদাকে কখনো কিছুই বলা হয়ে ওঠেনি, অথচ যা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এবং প্রিয়ংবদার নিজের বিস্ময় ব্যথা অভিমানও তার জন্যে কম ছিল না। শুধু প্রিয়ংবদাই কেন, পাড়ার আশে পাশে আরও অনেক মেয়েই ছিল, যারা আমার দিক থেকে কখনো কোনো সাড়া পায়নি। এবং সে বিষয়ে যে মোটেই সচেতন ছিলাম, তা কিন্তু একেবারেই নয়।

যেমন ধর, হেডমাস্টার মশাই, নরেন বাঁড়ুজ্জের মেয়ে বিনু। বিনুর নিজের ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়, এ কথাটা আমাকে শুনতে হয়েছিল দিদির কাছ থেকে। মাস্টার মশাইয়েরও সেরকম ইচ্ছে ছিল। যেহেতু আমি ছিলাম সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, এমনকি, রূপবানও বটে, সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই, আমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম কারুর কারুর। কথাটা এখন নিজের মুখে তোমাকে বলতে লজ্জা করছে না, কারণ তখন তো সেভাবে আমিও ভেবে দেখিনি, বুঝতেও পারিনি, এখন সেভাবে বুঝতে পারছি। সে সব দেখে শুনেই তো, আমার মা প্রায় নিশ্চিন্তই ছিলেন আমাকে নিয়ে। ন্যায়রত্নের কথাটা সেজন্যে তিনি আর মনেও করতে পারতেন না। বরং অবিশ্বাসই করতেন। এবং সারা জীবন তাই করে গিয়েছেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমার মত ছেলেকে দিয়ে যে ওসব ভাবাও যেত না।

তুমি বোধহয় জানতে, কাশীতে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আমাদের বলতে, বাবা কাকা জ্যাঠা, সকলের মিলিত সম্পত্তিই সেটা ছিল। যাদের যখন ইচ্ছে হতো, সে-ই গিয়ে সেখানে সাময়িকভাবে থাকতেন। তবে, জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর, জ্যাঠাইমা নিয়মিত সেখানেই থাকতেন। আমার জ্যাঠতুতো দাদাদের মধ্যে তেমন বনিবনা ছিল না, সেই অশান্তির একটা কারণ, তা ছাড়া মেজদা থাকতেন কাশীতেই, অর্থাৎ জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে, তাঁর সেখানে ব্যবসা ছিল। অতএব কাশীতে জ্যাঠাইমার পুণ্যি ও শান্তি, দুই-ই

ছিল। মেজ-বউদিও জ্যাঠাইমার সঙ্গে খুব মানিয়ে চলতেন। অভাব একটাই মাত্র ছিল। মেজদার কোনো সন্তানাদি হয়নি। আশাও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ মেজ-বউদি ষোল বছরেব মেয়ে এসে-ছিলেন, ছাব্বিশ বছরের মধ্যেও তাঁর কোনো সন্তানাদি হয়নি। ডাক্তার, বৈদ্য, বিশ্বেশ্বর ও নানান ঠাকুরের দোর ধরা থেকে, টোটকা-টুটকি কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয়নি।

মেজ-বউদি আমারই সমবয়সী। বাইরের থেকে কোনো মেয়েকে দেখেই যেমন বন্ধ্যা বলে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না, মেজ-বৌদিরও তাই। এমনিতে মাঝারি চেহারা, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ছেলেপিলে হয়নি বলেই, সাজগোজের অবসর এবং মন দুই-ই ছিল। ঠাকুব দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছু ছিল না। অথচ, সন্তান কামনায় একটু বাড়াবাড়ি হওয়াটা বিচিত্র ছিল না। হয়তো প্রথমদিকে প্রতিদিনই বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে যেত, শেষদিকে, অর্থাৎ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে আর রোজ জল টানাব উৎসাহ ছিল না। আমাদের এখানে, বাঙলা দেশের বাড়িতে যখন থাকতেন, তখনো প্রায়ই মেজ-বউদিব সঙ্গে গল্পগুজব আড্ডা হতো। তাব কাজকর্ম কম ছিল বলে, আড্ডার সুযোগটা তাব বেশী ছিল। আমার সঙ্গে মেজ-বউদির সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর পর্যায়েই পড়ত।

তবে অনেক সময় বৌদি-দেওরদের মধ্যে যেরকম কাঁচা রসিকতা ইত্যাদি হয়ে থাকে, আমার সঙ্গে তা কখনোই ছিল না, কারণ কাঁচা রসিকতা করবার মত ভাষা আমার জানা ছিল না। তবু, মেজ-বউদি মাঝে মাঝে এমন দু একটা কথা বলে উঠত, যাতে আমার কান লাল হয়ে উঠত। পরে অবিশ্যি মেজ-বউদি তার জন্যে ক্ষমা চাইত, যদিচ, তা চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি ওসব নিয়ে কোনোদিন কোনো কথা তাকে বলিনি। এবং মনে করতাম, মেজ-বউদির ও ধরনেব কথা বলবার অধিকার আছে। তা ছাড়া, মেজদা ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। লেখাপড়া তেমন করেননি, বংশগত পাণ্ডিত্য বা যজমানিও গ্রহণ করেননি, আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যবসায়ী তিনিই

ছিলেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গিটাই এমন ছিল যে, হেসে কথা বলতে তাঁকে বড় একটা দেখা যেত না। অথচ মানুষ হিসেবে যে রুক্ষ প্রকৃতির ছিলেন, তাও নয়। একটু বেশী চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। কোনো বিষয়েই খুব একটা চঞ্চলতা বা উদ্দীপনা প্রকাশ পেত না। মেজ-বউদি আবার সেরকম ছিল না। একটু সেজেগুজে, হেসে গল্প-গাছা করে কাটাতেই ভালবাসত।

যাই হোক, সেবার, তখন আমার বছর ছাব্বিশ বয়সই হবে, ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে কাশীর বাড়ি গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে আমি একলাই গিয়েছিলাম। মা দিদি ওরকম গরমে যেতে চাননি, আমাকেও যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু কেন জানি না, সেই বছর আমার কাশীর দিকে মন টানল। তা ছাড়া মেজ-বউদি লিখেছিল, 'তোমাদের বাংলাদেশের থেকে কাশীর গরম অনেক ভাল, গায়ের জামাকাপড় ঘামে ভিজে সপসপ করে না। তা ছাড়া, একতলায় মায়ের ঘরটা এত ঠাণ্ডা, কাশীতে আছি বলে মনেই হয় না। তুমি চলে এস! তুমি এলে আমি এখন আর দেশে ফিরব না, নইলে কয়েকদিন গিয়ে কাটিয়ে আসব ভাবছি। তার চেয়ে, ঠাকুরপো, তুমি চলেই এস।'

মেজ-বউদিও ডাকছিল, তাই চলেই গিয়েছিলাম। কাশী গিয়ে ভালই লাগছিল। যতই ভিড় থাক, তবু সন্ধ্যাবেলা বা সূর্যাস্তের সময় যেতেই গঙ্গার ধার সত্যি অপূর্ব। তা ছাড়া নৌকোয় বেড়ানোটাও একটা নেশা ছিল। রোজই দুবেলা বাড়ি থেকে বেরুতাম। সঙ্গে কখনো জ্যাঠাইমা, কখনো মেজ-বউদি, কেউ না কেউ থাকতেন। আমার আর মেজ-বউদির প্রধান কাজ ছিল বাজার করা, এবং নানারকমের খাবারের সন্ধান করা। মেজ-বউদি নিজেও খুব ভাল রান্না করত। দিনগুলো সে বছর আমার বেশ ভালই কাটছিল। তার আগেও আমি কাশী গিয়েছি, কোনোবারই আমার খারাপ লাগেনি। তবে অন্যান্যবারে যেরকম ভিড় থাকে, সেবার সেরকম ছিল না। তার কারণ অবিশ্যি গ্রীষ্মকাল বলেই। কাশীর বাড়িতে

সব সময়েই শীতে ভিড় হতো। আমাদের পরিবারের লোকজন ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবরা যেত।

একদিন মেজ-বউদির শরীরটা খারাপ বলে, সন্ধ্যার দিকে আমি একলাই বেরিয়েছিলাম। জ্যাঠাইমা সন্ধ্যাবেলার দিকে চোখের দৃষ্টির স্বল্পতার জন্যে বেরুতেন না। আমি একলাই অনেকক্ষণ এ ঘাটে, ও ঘাটে কিছুক্ষণ নৌকোয় বেড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন বাতাসটা বেশ বেগে বইছিল। আর পশ্চিমে বাতাস একটু বেগে বইলেই ধুলো-ঝড় বেশী ওড়ে। সেদিনও ধুলো উড়েছিল এবং স্বভাবতই শহর, এমনকি গঙ্গার অনেকখানি জুড়েও ধুলোব একটা আবছায়া সৃষ্টি হয়েছিল। সবই দেখা যায়, কিন্তু একটা অস্পষ্টতা সর্বত্রই বিরাজ করছিল। নৌকোয় বেড়াবার সময় আলো জ্বলে ওঠা অস্পষ্ট শহবটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তোমাদেব কবির ভাষায় কী বলতে হবে আমি জানি না, আমি কিন্তু আবছায়া কাশীর একটা সৌন্দর্য অনুভব করছিলাম। সেইদিনই জীবনে আমার প্রথম মনে হয়েছিল, প্রখব স্পষ্টতাব চেয়ে, একটু অস্পষ্টতারও একটা অর্থময় সৌন্দর্য যেন আছে।

নৌকো থেকে নেমে, আমি একটা ঘাটে এসে উঠলাম। এখন আব তেমন ভাল মনেই নেই, কোন ঘাটে ঠিক উঠেছিলাম। তবে শহরের আলো দোকান গাড়ি ঘোড়া সেখান থেকে একটু দূরে ছিল, এইটুকু মনে আছে। আমি ওপরে উঠব কিনা ভাবছি, এমন সময় একটি মুখ আমার চোখে পড়ল। একটি মেয়ের মুখ।

একটি মেয়ের মুখ জীবনে অনেকবাব অনেক রকম ভাবেই চোখে পড়েছে, সেটা একটা কোনো বিশেষ ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু সেদিন একটু বিশেষই মনে হচ্ছিল যেন। কেন, আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারিনি, এখনো পারি না। শুধু একটি মেয়ের মুখই আমার চোখে পড়ল না, তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। আমার এমন মনে হয়েছিল তার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন সে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। মনে হয়েছিল, সে যেন ঘাড় নেড়ে আমাকে

কিছু বলতে চাইল, এবং অল্প একটু হাসল।

আমি অবাক হয়ে একবার পিছন ফিরেও তাকিয়েছিলাম, আমার পিছনে বুঝি, মেয়েটির নিজের কেউ আছে, কিন্তু দেখেছিলাম, সেখানে কেউ নেই। ও কে? আমি কি ভুল দেখলাম? আমারই চেনাশোনা কেউ নাকি? সেটা খুব অসম্ভব ছিল না, কেননা, কাশীর অনেক বাঙালী পবিবারের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ছিল। হয়তো পরিচিত কোনো বাড়িরই মেয়ে। এই ভেবে, আমি আবার তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, সে যেন কেমন একটি কৌতূহলিত উৎসুক চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু চিনতে আমি মোটেই পারলাম না। কোনোদিন দেখেছি বসেও স্মবণ করতে পারলাম না। যে কারণে, একটু ভাল করেই দেখবাব চেষ্টা কবেছিলাম আমি। মেয়েদের বয়স সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমার নেই। এখনো তেমন নেই, এবং বয়সটা আমার কাছে গৌণ ব্যাপাব। বিশেষ করে মেয়েদের বয়স। কাছাকাছি আলো ছিল। ধুলোব অস্পষ্ট আবছায়ায় সেই আলোয় আমি দেখেছিলাম, একটি যুবতী, বাঙালী আটপৌরে ধরনের, নীলচে ডোরাকাটা শাড়ি পরা। রংটা আমার ফর্সাই মনে হয়েছিল। তার চোখ দুটি বেশ ডাগর, এবং সেই চোখে কী একটা ছিল, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। এক একজনের চোখ থাকে, যেন মনে হয়, তার চোখ সব সময়েই নিঃশব্দে যেন কিছু বলে চলেছে। একেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বলে কি না, আমি জানি না। মুখখানি লম্বা ঠিক না, তবে গোলও নয়। কালো দুটি ভুরুর মাঝখানে একটি টিপ ছিল। কিন্তু ওই অস্পষ্টতার মধ্যেও আমার মনে হয়েছিল, টিপটা সিঁদুরের নয়। আমার ধারণা সিঁদুরের ফোঁটা অমন গাঢ় দেখায় না, মেয়েটির টিপ যেমন গাঢ় বর্ণ মনে হচ্ছিল। বোধহয় খয়েরী রং-এর টিপ ছিল। তার নাকটি বেশ তীক্ষ্ণ ধরনের, যে কারণে তার মুখে একটি এক ধরনের ধারালো ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। সম্ভবতঃ সে পান খেয়েছিল, তার ঠোঁট দুটি লাল বলে বোধ হচ্ছিল আমার।

মেয়েটি তার কালো বড় বড় চোখের তারা মেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল, অথচ স্বাভাবিক ভাবে যা হয়ে থাকে, ছু একবার ছেলেদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই, চোখ ফিরিয়ে নেয়, মেয়েটি সে ভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়নি। নেয়নি তো বটেই, বরং আমার মনে হয়েছিল, সে যেন আমাকে কিছু বলবে। এই ধারণা হওয়াতেই আমার কৌতূহল একটু বেড়েছিল। আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, তার গায়ে একটি জামা রয়েছে, অনেকটা হিন্দুস্থানী কাঁচুলি ধরনের, যা তার কোমর ও পেটের একটা অংশ মুক্ত রেখেছিল। কিন্তু সে ঘুরিয়ে, কুঁচিয়ে শাড়ি পরেনি, নিতান্ত বাংলা ধরনেরই সাদাসিধে ভাবে কাপড়টা পরা ছিল। বুকের একটা অংশ থেকে তার শাড়ি সরানো ছিল, এবং এখন স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই, তার উদ্ধত যৌবন যেন গাঢ় বর্ণের কাঁচুলির ওপর দিয়ে একটা দুর্বিনীত ভাব প্রকাশ করছিল। দুর্বিনীত বলতে আমি ঠিক কথাটা বোঝাতে পারলাম কি না জানি না। বোধহয়, এই বলতে চাইছি, তার যৌবন যেন কাঁচুলিতে অধবা হয়ে উঠতে চাইছিল, একটা বেআব্রু ধরনের প্রকট বলে বোধ হচ্ছিল। শুধু বুক নয়, তার সর্বাঙ্গের প্রতিটি বিভাগেই যেন তা ফুটে উঠছিল।

আমার মনে হয়েছিল, মেজ-বউদিও ওই জাতীয় দেখতে, অথচ অমিলটা ঘোরতর বলে মনে হচ্ছিল। মেয়েটির পায়ে আলতা ছিল কি না বুঝতে পারিনি। অল্প একটু ঘোমটা ছিল মাথায়, তবু টের পাওয়া যাচ্ছিল, ঘাড়ের কাছে একটি খোঁপায় চুল বাঁধা আছে। মাথায় সিঁদুর লক্ষ্য করতে পারিনি, কারণ সিঁথিটাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। হাতে চুড়ির ঝিলিক একটু আধটু দেখতে পেয়েছিলাম। শাঁখা আমার চোখে পড়েনি।

আমার আশেপাশে, অল্প হলেও, কিছু লোকজন চলাফেরা ওঠানামা করছিল। আমি ঠিক এভাবে কখনো কোনো মেয়ের মুখোমুখি হইনি। লোকজনের মাঝখানেই, অথচ যেন মেয়েটি সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন, একটা বিচিত্র ধরনের দূরত্ব সবকিছু থেকেই,

এবং রাত্রের আলো-আঁধারি ছাড়াও, ধুলোর আবছায়া, সব মিলিয়ে জীবনে সেই প্রথম আমি একটি অদ্ভুত শিহরণ বোধ করেছিলাম। জীবনে সেই প্রথম। আমি যখন তাকে কৌতূহলিত হয়ে দেখছিলাম, তখন সে স্পষ্টভাবেই একবার নিঃশব্দে হেসে উঠেছিল, আমি তার শাদা দাঁতের ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলাম। আর সেই মুহূর্তেই, আমার রক্তে একটা বিচিত্র দোলা অনুভব করেছিলাম, যা আমি আমার আগের জীবনে কখনোই অনুভব করিনি। অথচ, ওভাবে কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ শালীনতা ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কিন্তু সেদিন আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। কেন? আলো আঁধার, ধুলোর অস্পষ্টতা ছিল বলে? আমার মনের ভিতরে, বিশেষ করে সেই পরিবেশ কি কোনো ক্রিয়া করছিল?

আমি বুঝতে পারিনি। মেয়েটি হেসে, তার বুকের কাঁচুলির ওপরে শাড়ি তুলে দিয়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তা সরে গিয়েছিল, এবং আমার যেন স্পষ্টই তখন মনে হয়েছিল, মেয়েটি ঘাড় নেড়ে আমাকে যেন কিছু একটা ইশারা করল। আমার একবারও মনে হয়নি, এরকম একটা ঘটনা অস্বাভাবিক। আমি যেন কেমন এক রকম সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলাম, আমার বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা দাপাদাপি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই স্থির করতে পারিনি। মেয়েটি একটু নড়ে উঠেছিল সহসা, যেন চলে যাবে এমনি একটা ভঙ্গি করেই, একটা পা ওপরের সিঁড়িতে রেখেছিল। কিন্তু সে যায়নি। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটা অন্য রূপ নিয়েছিল। স্বভাবতই তার কোমর একটু বেঁকে উঠেছিল, প্রশস্ত নিতম্বে শাড়ি টান টান হয়ে উঠেছিল, যে কারণে, তার অবয়বের মধ্যে যে একটি প্রায় নির্লজ্জ যৌবনের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছিল, তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

আমি নিজেকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার সমাজ ও পরিবেশ অনুযায়ী, যা আমার উচিত, তা আমি কিছুই করিনি, আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ফিরে যাইনি।

বরং আমি কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে, তার কাছাকাছি হয়েছিলাম। আমার গলায় তেমন স্পষ্ট স্বর না থাকলেও, অস্পষ্টভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?'

মেয়েটি যেন সহসা লজ্জা পেয়ে, অল্প একটু হেসে, মাথা নামিয়েছিল। আবার পরমুহূর্তেই তার সেই ডাগর অর্থপূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। এবং পরিষ্কার বাংলাতে, বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলেছিল, 'দেখছিলাম।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

কাছাকাছি হবার জন্যে তখন আমি তার মুখ অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিও ঘোমটার ছায়া একটা পাশে অস্পষ্ট করে রেখেছিল। দেখেছিলাম, তার ঠোঁটের কোণে, ঠিক তার চোখের দৃষ্টির মতই একটি অর্থপূর্ণ হাসি। তার গা থেকে একটা সুন্দর গন্ধ আসছিল। সম্ভবতঃ খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো ছিল। গন্ধটা আমার সেরকমই মনে হচ্ছিল। কিংবা বেলফুলের গন্ধওয়ালা ভাল আতর কাশীতে তখন পাওয়া যেত, কাশীখণ্ডের মধ্যেই গাজীপুর জেলা শহরে আতর তৈরী হতো। সেই গন্ধটাও আমাকে কেমন যেন নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

এবার মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে, একটি বিশেষ ভঙ্গিতে, (অপাঙ্গে?) তাকিয়েছিল। তখন সব মিলিয়ে, তার গোটা শরীরে একটি অপূর্ব ভঙ্গি ফুটেছিল। বলেছিল, 'প্রায় রোজই তো দেখতে পাই, দুজনের ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে।'

ওর ভাষাটা আমাকে একটু অবাক করেছিল। যেরকম কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত, তার কথা যেন ঠিক সেরকম নয়। দুজন বলতে সে কাকে কাকে বোঝাচ্ছিল, ধরতে না পেরে, মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

মেয়েটি বলেছিল, 'রোজ সন্ধ্যাতেই তো দেখি, এখানে ওখানে গিন্নি কর্তাকে সামলে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

আমি বিস্মিত অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কর্তা গিন্নি ?'

'কেন, যে বউটিকে সঙ্গে দেখতে পাই ?'

নিশ্চয়ই মেজ-বউদির কথা বলছিল। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'না না, উনি আমার বউদি হন।'

তখন মেয়েটিও একটু অবাক হয়ে, চোখ আরো বড় করে, জিভ কেটে বলেছিল, 'ও মা, ছি, তাই নাকি ? আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।'

পরমুহূর্তেই তার শরীরটা কেঁপে উঠেছিল। সে হাসছিল। বলেছিল, 'কি করে বুঝব, কর্তাকে ছেড়ে যে কেউ দেওরের সঙ্গে রোজ রোজ ঘুরে বেড়ায়, তা তো জানি না।'

কথাটা শুনে সেইসময় আমার রাগ করাই উচিত ছিল। অথচ আশ্চর্য, আমি মেয়েটির ওপর রাগ করতে পারিনি। পারিনি, কারণ, আমি আর তখন সেই আমি ছিলাম না। কাশীর সেই গঙ্গার ঘাটের আলো-আঁধারিতে, জীবনে আমার নতুন পদক্ষেপ ঘটতে যাচ্ছিল। পদস্খলনও বলতে পার। তখন একবারের জন্যেও মনে হয়নি, বৃন্দাবনচন্দ্র ন্যায়রত্নের ভবিতব্য ফলতে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য বিস্মৃতি ! অভিশপ্ত বিস্মৃতি ! নিজের দূরের কথা, মানুষের যে এমন দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। পরে আমি সে কথা অনেক ভেবেছি। কিন্তু কী করে অমন আশ্চর্য পরিবর্তন আমার হয়েছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। তখন কি একবার বাবার কথা মনে হতে পারেনি ? আমার পরিবার, পরিবেশ, কোনো কথাই কি একটু উঁকি দিতে পারেনি ?

কোনো কথাই মনে হয়নি। বরং আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে এসেছি, এসেছি এক ফুলের গন্ধের মধ্যে, একটি নারীর যৌবনের দুয়ারে। আর কিছু ভাবিনি। আর কিছু ছিল না আমার সামনে। অথচ, এখনো যেমন জানি, তখনো তেমনিই

দেখেছিলাম, সে যৌবন কোনো সদ্য ফোটা ফুলের মত, অনাঘ্রাত পবিত্র তাজা নয়। অন্ততঃ সে কথা আমার একবারও মনে হয়নি। যেমন প্রিয়ংবদা বা হেডমাস্টার মশাইয়ের মেয়ে বিনুকে দেখে মনে হতো। আর তা মনে হয়নি বলেই, সম্ভবতঃ সেই মেয়েটি আমাব কাছে বৈশিষ্ট্যময়ী হয়ে উঠেছিল। ব্যতিক্রমই বোধহয় মানুষকে আকর্ষণ করে বেশী।

আমি কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। আমার রক্তের শিরায় একটা প্রবাহ। গলা শুকিয়ে উঠছিল। চলে যাওয়াই উচিত ছিল, তবু আমি জিজ্ঞেস কবেছিলাম, 'আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

সে একদিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, যা থেকে কিছুই ঠিক বোঝা যায়নি। যেন কোনো রহস্যেব ইঙ্গিতে আঙুল দেখাতে গিয়ে, তার শবীবের ভঙ্গি আর এক রূপে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। তখন দেখেছিলাম, তার কাঁচুলির হাতা কাঁধেই শেষ, এবং সেখান থেকে তাব পুষ্ট ডানা দুটি নিটোল নেমে এসেছে, আমি অস্পষ্টভাবে হলেও তাব স্বল্প রোমশ কুক্ষিতল দেখতে পেয়েছিলাম।

তেমনি ভাবে ঘাড় বাঁকিয়েই সে বলেছিল, 'আমাকে এত আপনি বলাটা ভাল নয়। একটা কথা বলছিলুম—।'

কথাটা শেষ না করেই সে থেমেছিল। আমি তার দিকেই তাকিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'কী?'

বলেছিল, 'আজ যখন সঙ্গে কেউ নেই, আমার সঙ্গে এলেও তো হয়।'

অমন অবলীলাক্রমে একটি মেয়ে কেমন করে অপরিচিত পুরুষকে ডাকতে পারে, সে কথাটাও তখন আমার মনে হয়নি। এর থেকে আর আশ্চর্যের কী হতে পারে! কিংবা ওভাবে কোনো মেয়ে ডাকলেই যে যেতে নেই, এই বোধটুকুও আমার হারিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার কথা বলার অদ্ভুত ভাষা, ভঙ্গি, কিছুই আমার মনে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কারণ, আমি তখন সকল জিজ্ঞাসা-বাদের বাইরে চলে গিয়েছিলাম।

অবিশ্যি, সম্মতিসূচক কোনো কথা আমি বলতে পারিনি। শুধু তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম।

সে কিন্তু আমাকে আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করেনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। হয়তো তার মত দৈহিক গঠন স্বাস্থ্যবতী যুবতী আমি আগেও দেখেছিলাম, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়, সমস্ত দেহে অমন রক্তে দোলা লাগানো তরঙ্গ আর কখনো দেখিনি। সে উচ্চতম ধাপে উঠে একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমি তখনো দাঁড়িয়েছিলাম। সে ফিরে তাকাতেই, আমি তাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর সে আমার আগে আগে এগিয়ে চলতে লাগল, আমি তার দিকে তাকিয়ে, তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। আমি যেন তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। সে মাঝে মাঝে আমাব দিকে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। তার কালো বড় বড় চোখ দুটিতে, এমনকি কপালের টিপটিও যেন আমার দিকে, সেই বিচিত্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। সর্বক্ষণই তার ঠোঁটে লেগে ছিল সেই হাসিটি। যে হাসিটিকে কী দিয়ে স্পর্শ করলে, আমার প্রাণ ভরে উঠবে, আমি তখনো তা জানতাম না। কোন রাস্তা, কোন গলি দিয়ে যে সে চলছিল, আমি একবারও ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। কতক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আমি হেঁটেছিলাম, কিছুই আমি জানি না। আমি কেবল একটি চুম্বকের টানে এগিয়ে চলেছিলাম।

এক সময়ে আবিষ্কার করেছিলাম, আমি একটি ঘরে এসে বসেছি। বড় একটি ঘর। একপাশে একটি খাটে বিছানা, জামা-কাপড়ের আলনা, সেকালের একটি আলমারি। গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিসও দেখেছিলাম। থালা বাসন, ধোয়া হাঁড়ি কড়া। কিন্তু রান্নার উনুন বা কালিঝুলি, কোথাও চোখে পড়েনি। বাড়িটা

যে ঠিক কেমন, তাও স্মরণ করতে পারি না এখন। তবে একটা উঠোন ছিল, উঠোনে ঝুপপি মত কোনো গাছপালা ছিল, আর সম্ভবতঃ বেলফুল গাছও ছিল, কারণ ফুলের গন্ধটা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল। আর কোনো লোকজন আমার চোখে পড়েনি। তবে, পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটায় যে একটা ঘর নয়, তা বুঝতে পারছিলাম। অন্যান্য ঘরগুলো যে বন্ধ, তাও আমার মনে হয়নি, মনে পড়ছে যেন। আলো দেখতে পেয়েছিলাম ও মানুষের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যাকে অনুসরণ করে গিয়েছিলাম. তাকে ছাডা আর কাউকেই দেখতে পাইনি।

তাব ঘবে ছিল উজ্জ্বল হ্যাবিকেনেব আলো। একটি ছোট্ট কুলুঙ্গিব মধ্যে টিম্‌টিম্ করে প্রদীপ জ্বলছিল, ক্ষীণ আলোয় ছোট একটি গণেশমূর্তি আমার চোখে পড়েছিল। ঘরে ঢোকবার পূর্বমুহূর্তে আমি যখন দবজাব কাছে একটু দ্বিধা কবে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সে ঘাড় নেড়ে আমাকে ভিতরে আহ্বান করেছিল এবং খাটের কাছে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, যেন আমাকে বসতে বলছে। মুখে না বললেও যে এত কথা বোঝবার ক্ষমতা আমার ছিল, আগে তা জানতাম না। আর কোনো বসবার ব্যবস্থা ছিল না। আমি খাটের ওপরেই বসেছিলাম পা ঝুলিয়ে।

মেয়েটি সহসা উপুড় হয়ে, যেন আমার পা দুটো সে নিজেই খাটের ওপর তুলে দেবে, এমনি ভাবে, পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠেছিল, 'পা ঝুলিয়ে কতক্ষণ বসা যাবে। তুলে বসাই তো ভাল।'

আমি বাধা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোনো ক্ষমতা ছিল না আমার। পা তুলে নিয়েছিলাম। তার স্পর্শ তখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপী এক অপরিচিত উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি কী বলব, কী বলা উচিত, কিছুই বুঝতে পারিনি। দেখেছিলাম, মেয়েটির মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। নিশ্চয়ই সে সন্ধ্যাবেলা চুল বেঁধেছিল, তার খোঁপা সে রকমই দেখাচ্ছিল, আর খোঁপায় সত্যি মোটা বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো

ছিল। সে আমার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তার বুকের একপাশ থেকে নীল ডোরা শাড়ির আঁচল সরে গিয়েছিল। একটি সরু হার তার দীর্ঘ পুষ্ট গলায় ছিল। না, দীর্ঘ বলা বোধহয় ভুল হলো। কিন্তু তার গলাটিও সুন্দর লেগেছিল। কিংবা এই সব যা-কিছু বর্ণনা দিচ্ছি, এ সবই আমার নিজের কল্পনা। আমি তার সবকিছুই সুন্দর দেখছিলাম, যার মধ্যে, যার সবকিছুর মধ্যেই, আমার চিরদিনের চেনা পরিচিত সৌন্দর্যের ব্যতিক্রম ছিল, যা আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম। একটি নাকচাবিও ছিল তার নাকে। দেখছিলাম, নাকচাবিটা চিক্‌চিক্ করে উঠছে। সে যেন নিশ্বাসে বেলফুলের গন্ধ ছড়িয়ে ফেলে, নিচু গলায় বলেছিল, 'কী খেতে দেব ? আগে একটু সরবত দেব ?'

কিন্তু আমার তখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ প্রতিবাদ করার মত কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সে ঘরের এক পাশে সরে গিয়ে, ঠুং ঠাং শব্দে বাসনপত্র নাড়াচাড়া করেছিল, তারপরে একটি ছোট রুপোর গেলাসে সরবত এনে আমার সামনে ধরেছিল। প্রায় মুখের কাছে এনে ধরাতে, আমি হাত বাড়িয়ে ধরেছিলাম, তখন তার হাতে আমার স্পর্শ লেগেছিল। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। আবার সরে গিয়ে, একটি পেতলের রেকাবীতে কয়েকটি প্যাড়া সামনে ধরেছিল। তখনো আমি গেলাসে চুমুক দিইনি। সে নিজের হাতে প্যাড়া তুলে, আমার মুখের সামনে তুলে ধরেছিল, আমার ঠোঁটে ছোঁয়াতে, বাধ্য ছেলের মত হাঁ করেছিলাম। সে মুখের মধ্যে প্যাড়া গুঁজে দিয়েছিল। তারপরে আমি সরবতের পাত্রে চুমুক দিয়েছিলাম।

পাত্রে সরবত ছিল ঠিকই, কিন্তু সিদ্ধির সরবত। তখন আমার সেসব কথা মনে হয়নি, যদিচ সিদ্ধির স্বাদ আমার জানা ছিল, তার আগেও আমি সিদ্ধি খেয়েছি। সে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঠোঁটে তার আঙুল স্পর্শ করে প্যাড়া খাওয়াচ্ছিল, তখন

তার উদ্ধত বক্ষদেশ নিশ্বাসের তালে, আমার খুব কাছেই ওঠা-নামা করছিল। আমি তার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না। সে যেন তা বুঝতে পেরেই, তার নিজের মুগ্ধতাও প্রকাশ করার জন্যে, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ঘাড় কাত করে, চোখের কোণ দিয়ে আমাকে নিবিড় ভাবে দেখছিল। সে এমন করে দেখছিল, এবং শুধু দেখার ভিতর দিয়েই যে মানুষের রক্তে একটা প্লাবন সৃষ্টি হতে পারে, আগে তা জানা ছিল না।

এ যে কী আশ্চর্য ব্যাপার আমার পক্ষে, ওইরকম পরিবেশে, একটি মেয়ের কাছে ওইভাবে বসে, তার হাত থেকে খাওয়া, সাহিত্যিক, তোমরা যারা আমাকে অতীতে বা বর্তমানেও দেখেছ, তাদের পক্ষে কি বিশ্বাসযোগ্য! শুধু তাই নয়, আমার ভিতরের যা-কিছু সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা, সব ঘুচে যাচ্ছিল, আমি আমার মধ্যে এক নতুন মানুষকে আবির্ভূত হতে দেখছিলাম। শেষ প্যাড়াটি খেয়ে, সরবতের গেলাসে আমি শেষ চুমুক দিয়েছিলাম। আর মেয়েটি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার ঠোঁট আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিয়েছিল। আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছিলাম না। আমি তার সেই মুছিয়ে দেওয়া হাতটি ধরেছিলাম।

মেয়েটি যেন নিবিড় চোখে সেই ধরা দেখল, আমার হাতটা দেখল সে, আর আস্তে আস্তে আমার সেই হাতটি তার ঠোঁটে ছোঁয়াল। আমি এক দুঃসহ উন্মাদনায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছিলাম। তাকে আকর্ষণ করবার জন্যে আমার ভিতরটা আকুলবিকুলি করছিল। কিন্তু সে আমার হাত থেকে গেলাস নিয়ে, গেলাস রেকাবী রাখতে সরে গিয়েছিল। সরে গিয়ে দূর থেকে সে আমাকে আবার দেখছিল। তারপরে সে দরজা বন্ধ করে, আবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার প্রতিটি চলার মধ্যেই, এমন একটি মন্থর তরঙ্গ দোল খাচ্ছিল, যার মধ্যে আমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার দিকে তাকিয়েই সে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়েছিল হাতে, আমার দিকে তার সেই উজ্জ্বল চোখ রেখেই, একটু একটু করে শিখা কমিয়ে দিয়েছিল।

একেবারে নিবিয়ে দেয়নি, সামান্য একটু, ছায়া ছায়া দেখা যায়। এমনি আলোর রেশ মাত্র রেখে, হ্যারিকেনটা সে রেখে দিয়েছিল, রেখে সেখানেই দাঁড়িয়েছিল।

মত্ত পুরুষের মধ্যে তখন যা-কিছু ঘটে, সবই আমার মধ্যে ঘটছিল। সে দাঁড়িয়ে পড়াতে আমি খাট থেকে নেমে এসেছিলাম, তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সে তার একটা হাত আমার বুকে তুলে দিয়েছিল। আমি তাকে দু হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছিলাম। করতেই সে এমন নিবিড় ভাবে আমাকেও জড়িয়ে ধরেছিল, আমার সর্বদেহে এক বিচিত্র তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। মানুষকে জীবধর্মের কিছুই শেখাতে হয় না, যা চির অকল্পিত ছিল, আমি তাকে চুম্বন করেছিলাম। সে যেন আমার মত্ততায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করে হেসে উঠেছিল, আমার হাত ধরে খাটের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরে ঈষৎ আলোয়, তাকে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন দেখেছিলাম, যা আগুনের চেয়েও উজ্জ্বল ও তীব্র, যে আগুনে আমি নিজেকে, পতঙ্গের মত থর থর করে কাঁপতে দেখেছিলাম। তথাপি আমি থমকে রইলাম। আমার ভিতরে যেন হাজার কাড়ানাকাড়া বাজতে লাগল। আহার মৈথুনাদি সকলই জীবধর্ম বটে। মানুষের বেলায় তার প্রকাশটা, জীবজগতের সঙ্গে পুরোপুরি বোধহয় মেলে না। আমি কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অথচ যা করনীয়, সেটা যেন আমার ভিতরে রূপ পাচ্ছিল। সে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে, তার শরীরের ওপর টেনে নিয়েছিল। আমি তাকে বারে বারে চুম্বন করেছিলাম। সে আমাকে তার প্রতিদান দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ আগে যাদের দেখা হয়েছিল, কারোর সঙ্গে কারোর পরিচয় ছিল না, তারা কী করে এরকম একটা আচরণ করতে পারে, তখন আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি। নিজেকে নিয়ে আমার যে এত বিস্ময় ছিল, তা জানতাম না। সে যেন অবাক হয়ে একবার হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'কিছু জানা নেই নাকি? এ কথা আমাকে

বিশ্বাস করতে হবে ?'

কী জানার কথা সে বলেছিল, তা তখন আমি জানি না। একটা অন্ধ তাড়নায়, আমি কেবল তাকে চুম্বন এবং আলিঙ্গন করেছিলাম। কোনো কথা যে তাকে জিজ্ঞেস করব, সে-স্বর আমার গলায় ছিল না। আমার শিরায় শিরায় আগুন। আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আগুন।

সাহিত্যিক, তারপরে সে যে সব আচরণ করেছিল, তা আর লিখে প্রকাশ করা যায় না। সে আমাকে নগ্ন করেছিল। নিজেকে আমি সেভাবে তার আগে কখনো অবলোকন করিনি। সে যেন বড় বিস্ময়ে ও সুখে, আমাকে নিয়ে পুতুলের মত খেলেছিল। পাপ বল, আর জীবধর্মের একটা শিক্ষাই বল, সে-ই আমাকে দেখিয়েছিল, শিখিয়েছিল।

তখন কত রাত্রি হবে, আমার খেয়াল নেই। আমার সহসা নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হয়েছিল, আমি এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখেছিলাম, আমার গায়ে জামা নেই, কিন্তু ঘড়িটা হাতে রয়েছে। আমি শুয়ে আছি সেই খাটেই। ঘরের মধ্যে তেমনি ক্ষীণ আলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসেছিলাম। দেখেছিলাম, আমার পাশে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েটি, আমার দিকেই কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে। সব কথা মনে পড়তেই, আমার শিরদাঁড়াসুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। স্বপ্ন নয়, একেবারেই স্বপ্ন নয়। যা ঘটবার, তা নিরঙ্কুশভাবেই ঘটে গিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে, আলোর শিখা বাড়িয়ে, আমার ঘড়ি দেখেছিলাম। রাত্রি প্রায় বারোটা। আমি তৎক্ষণাৎ কাপড় ঠিক করে, জামা গায়ে দিয়েছিলাম। একটা কিছু আমার ভিতর থেকে ঠেলে উঠছিল। সেটা একটা চীৎকার না আর কিছু, তা বুঝতে পারছিলাম না।

মেয়েটিও উঠে বসেছিল, আর তখন তার দিকে চোখ পড়া মাত্র,

কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠেছিল, দেহোপজীবিনী। আমি এক দেহোপজীবিনীর ঘরে। আমি এতক্ষণ তারই শয্যায়, তারই আলিঙ্গনে ছিলাম। অরবিন্দ চক্রবর্তী নামক ছাব্বিশ বছরের এক যুবক, প্রাচীন পণ্ডিত বংশের ছেলে, শিক্ষিত, তার প্রথম কৌমার্যভঙ্গ, যৌবরাজ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করেছে এক বেশ্যার দেহে উপগত হয়ে।

প্রথমেই মনে পড়েছিল, আমার উপনয়নের দ্বিতীয় দিনে ন্যায়রত্ন মশাইয়ের সেই ঘোষণা, তারপরেই বাবার মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, গলার কাছে কিছু একটা আটকে যাচ্ছিল। বুঝতে পারিনি, চোখ দিয়ে কখন জল পড়তে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে, আমার কাছে যা সামান্য টাকা ছিল, সব তুলে খাটের ওপর রেখে দিয়েছিলাম। মেয়েটি যেন কী বলেছিল। কাপড়চোপড় ঠিক করে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, এবং সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

বাইরে বেরিয়েই, আগে আমি গঙ্গার কথা চিন্তা করেছিলাম, জলে ঝাঁপ দেবার জন্যে। না, মৃত্যুকামনায় নয়। স্নানের জন্যে, সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে অবগাহনের জন্যে। এখন মনে করতে পারি, আমি যেখানে গিয়েছিলাম, সেটা কাশীর সেই বিখ্যাত পল্লী নয়। বা মেয়েটি সেখানকারও নয়। কাশীতে দেহবৃত্তির নানান পরিবেশ আছে, যা বাইরে থেকে অনেক সময় কিছুই বোঝা যায় না। এবং এইসব মেয়েরা, বাংলা দেশেই, একদা সমাজে কোনো অন্যায় করে ফেলে, বিতাড়িত হয়ে কাশীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রেম করে ঘর ছেড়েও যায় অনেকে, তারপর বিপদে পড়ে, কারণ প্রেমিকের ঘোর কাটলেই, সে শিকলও কাটে। অনেক সময় কুমারী মেয়েরা গর্ভপাতের জন্যেও কাশীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর এই পরিণতি, একমাত্র জীবিকা হয়ে দাঁড়ায় দেহ। একটাই তফাৎ,

বারোবাসরের পরিবেশ থেকে দূরে সরে থেকে, একটা গার্হস্থ্যের পরিবেশ বজায় রাখে।

আমি গঙ্গার ধারে উপস্থিত হয়ে, জামাকাপড়সহই জলে ডুব দিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিলাম। ঘড়িটা রেখেছিলাম সিঁড়িতে। কিন্তু ন্যায়রত্ন মশাই এবং বাবার মুখ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এবং নিজেকে সেই না চেনার বিস্ময়ে, ধিক্কারে, একটা তীব্র যন্ত্রণায় লজ্জায় ভয়ে, কেবল নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিলাম। আসলে আমার খুব চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সেটা পারছিলাম না। আশেপাশে নৌকো ও মাঝিরা ছিল, ঘাটেও দু একজন সাধু সন্ন্যাসী গোছের লোক শুয়েছিল।

আমি জল থেকে উঠে, জামাটা খুলে, নিওড়ে নিয়ে, ঘড়িটা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। চোখের জল মুছে, ভিতরের ঝড়কে গোপন করে, মুখ অবিকৃত রেখে, আমি একটা মিথ্যা কৈফিয়তের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেই তো মিথ্যার শুরু! জীবনব্যাপী মিথ্যার সেই তো শুরু।

বাড়ি ফিরে দেখেছিলাম, সদর দরজাটা খোলা। দালানের বারান্দায় আলো জ্বলছে, জ্যাঠাইমা, আর মেজ-বউদি বসে। মেজদা উঠোনে পায়চারি করছেন। তিনজনেই আমাকে দেখে, একসঙ্গে নানান কথা বলে উঠেছিলেন। মেজদা অনেক জায়গায় খুঁজে এসেছেন। আমি শেষপর্যন্ত খানিকটা পরিহাস তারল্যের সঙ্গেই জানিয়েছিলাম, শরতের দোকান থেকে সিদ্ধি খেয়ে আমি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বাড়ি চলে আসব, কিন্তু আমি যে কোথায় কোথায় ঘুরেছি, কিছুই জানি না। তারপরে যখন খেয়াল হলো, দেখলাম আমি একটা ঘাটে বসে আছি। খেয়াল হতেই, নেশা কাটাবার জন্যে আগে স্নান করেছি, তারপরে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসছি।

মেজ-বউদি রেগে হেসেছিল, জ্যাঠাইমা খুব বকেছিলেন ওরকম

ছেলেমানুষি করার জন্যে, আর মেজদা খালি বলেছিলেন, 'যা যা, ভেজা জামাকাপড়গুলো ছেড়ে ফ্যাল্‌গে যা।'

কাশীতে এক আধ দিন সিদ্ধি খেয়ে ফেলাটা গর্হিত কিছু নয়। পরে এ কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে। সাহিত্যিক, আমি জানি না, এর থেকে মনের তত্ত্ব তুমি কি আবিষ্কার করতে পারলে। কিন্তু আমি দেখেছিলাম, আমি এক অশুভ ভবিতব্যেরই শিকার হয়েছি। মনের বিচার বিবেচনা বা আমার মধ্যে কোথাও বিকার লুকিয়েছিল, সেসব চিন্তা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। বিশ্বসংসারে যুক্তিহীনভাবে, যাদের আমরা নিয়তির হাতের পুতুলের মত অশুভ ভবিতব্যের অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখেছি, আমি নিজেকে সেইরকমই গণ্য করেছিলাম।

সেই যেমন জীবনে একটা মিথ্যার শুরু হয়েছিল, তেমনি আর একটা ব্যাপারও শুরু হয়েছিল, হ্যাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বটা আরো দুঃসহ, অনেকটা রক্তে মাংসে লড়াইয়ের মতই, অথচ, পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও, এ লড়াই কোনো পক্ষ থেকেই থামে না, থামেনি কোনোদিন। এখনো, বাইরে থেকেই যা বোঝা যায় না, ধরা যায় না, যেন অনেকটাই পরাজয়কে অপ্রতিরোধ্য জেনেই আত্মসমর্পণ করে বসে আছি, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। হয়তো, এ লড়াই লোকের চোখে একেবারেই অর্থহীন, তা হোক। লোকের দেখাটা বড় কথা নয়, আমি নিজে দেখছি, এ লড়াই থামেনি, আবার কাশীর ঘাটের সেই আলো-আঁধারির নিশির ডাক, তা আমাকে কখনোই ছেড়ে যায়নি। আসলে, আমি যে শহরের যে পল্লীতেই যাই, সেই কাশীর ঘাট, সেই নীল ডোরা শাড়ি, গাঢ় রং-এর কাঁচুলি, খয়েরী টিপ, বেআব্রু উদ্ধত যৌবনই কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে যায়।

কিন্তু কাশীর কাহিনীটা এখানে শেষ করলে ভুল হবে, প্রায় একই অধ্যায়ের মধ্যে বলার মত আর একটি ঘটনাও এখনই ব্যক্ত

করা দরকার। তোমাকে সবই বলতে হবে।

সিদ্ধি খেয়ে, মাতাল হয়ে, কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, তারপরে জ্ঞান ফিরতে গঙ্গায় স্নান করে বাড়ি ফিরেছি, কথাটা কেউ-ই অবিশ্বাস করেনি। মেজ-বউদি বিশ্বাস করলেও, একেবারে নিছক ঘটনাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ঠাট্টা করে হেসে বলেছিল, 'সত্যি সিদ্ধি খেয়ে মাতাল হয়েছিলে, না কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছিলে?'

মেজ-বউদির কথার ধরন-ধারণ এই রকমই ছিল। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল। চেষ্টা করেছিলাম, মুখের ভাব যেন অপরিবর্তিত থাকে। মেজ-বউদি আমার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে, নিতান্ত হাসিচ্ছলেই বলেছিল, 'সিদ্ধির মাতাল তো অনেক দেখেছি। তোমার মত এমন দেখিনি যে, গঙ্গায় ডুব দিলেই মাতলামি সেরে যায়। তাই জিজ্ঞেস করছি, কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়নি তো! হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে, ভাল-মানুষ ছেলেটির মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।'

মেজ-বউদি কথাগুলো যত বলছিল, তত যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মেজ-বউদির যেন সবই জানা। যদিও, ভালমানুষ ছেলের মাথা চিবিয়ে খাওয়াটা সত্যি না। ভালমানুষ ছেলেটি নিজেই নিজের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিল। কিন্তু মেজ-বউদি এমন ভাবে বলেছিল, যেন ঘটনাটা তার অজানা নয়। কাশী সম্পর্কে মেজ-বউদির এরকম একটা ধারণা ছিল, সেখানে কুহকিনীরা ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। কাশী শহরে মায়াবিনীরা ঘুরে বেড়ায়।

ঘটনাটা ঘটবার পরে, কয়েকদিন আমি বাড়ির বাইরে যেতে পারিনি। অথচ মেজ-বউদির সামনে স্বাভাবিক থাকাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। আমি বইয়ের আশ্রয় নিয়েছিলাম, যেন সব সময়েই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। আসলে আমার ভিতরে তখন অন্তর্দাহ শুরু হয়েছিল। সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে যেন পুরোপুরি বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছিল না। সমস্তটাই একটা স্বপ্নের

মত বোধ হচ্ছিল। অথচ বুঝতে পারছিলাম, সর্বনাশ যা ঘটবার, তা ঘটে গিয়েছে। সব থেকে ভয়াবহ যা, তা হলো, সর্বনাশ যা ঘটে গিয়েছে, তা একটিমাত্র ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভয়াবহ ছিল এই, সর্বনাশ তখন আমার রক্তের মধ্যে পাক খেতে শুরু করেছিল। আমার রক্তের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। যা অবাস্তব স্বপ্নের মত আমার অনুভূতির মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছিল, তা যেন আমাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। চিরদিনের অবোধ অপরিচিত শরীরের মধ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল। অন্তর্দাহের কারণ তা-ই।

নিজেকে যত শাসন করবার চেষ্টা করছিলাম, ততই যেন সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। একদিকে স্খলনের যন্ত্রণা, আর একদিকে হাতছানি, এই দুয়ের মধ্যে পড়ে আমি পিষ্ট হচ্ছিলাম। ন্যায়রত্নের কথা আমার মনে পড়ছিল। বাবার উপদেশ বারে বারে স্মরণ করেছিলাম। কিন্তু কোনো অস্ত্রই যেন আমাকে রক্ষা করতে পারছিল না। ক্রমেই যেন সমস্ত ব্যাপারটা একটা অমোঘ নিয়তির মত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল। যত কাল জলস্রোতের মুখ বন্ধ ছিল, তত কাল জলস্রোতের জানা ছিল না, কোন বিচিত্র গতিপথের ঢালুতে সে ধাবিত হবে। একবার সেই মুখ খোলা পেয়ে, তার গতিকে সে আর নিজেই রোধ করতে পারছিল না। তখন কেবল একটা ছুটে চলার বেগ।

তথাপি আমি সন্ধ্যা আহ্নিক জপ নিয়মিত শুরু করেছিলাম। সে সব ছিল আমার বাবার উপদেশ। কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত হলে, সে সব করাই ছিল বাবার নির্দেশ। আমার শিক্ষা দীক্ষা, যুক্তি সবই ভেসে যাচ্ছিল। কোনো কিছু দিয়েই তাকে আটকে রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু তখনো আমি বুঝতে পারিনি, সর্বনাশ কোনখানে তার গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

পড়াশোনা এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত সময় কাটালেও, মেজ-বউদি বাড়িতেই ছিল। আমার সেই পরিবর্তনটা তাকে কৌতূহলিত

এবং জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। যদিও তার মধ্যে কোনো কূট সন্দেহ ছিল না। মেজ-বউদি ধরে নিয়েছিল, ছেলেদের এক একসময় এক এক রকম মনে হয়। তবু তার ঠাট্টা বিদ্রূপ সমানেই চলছিল।

আমি মেজ-বউদির দিকে না তাকাবারই চেষ্টা করতাম। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে, মেজ-বউদিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম, যদিও এক বাড়িতে থেকে সেটা সম্ভব ছিল না। মেজ-বউদি আমাকে নিয়ে যেমন বেরোত, সেরকম বেরোতে চাইত। আমার চোখের সামনে সেই ধুলো-ঝড় আবছায়া ঘাট এবং নারী-মূর্তি ভেসে উঠত। আমি বাইরে বেরোতে চাইতাম না।

কিন্তু সাহিত্যিক, আমার মানসিক সংগ্রামের জটিলতা এবং গভীরতা আরো অনেক বেশী ছিল। অকারণ কথার জাল সৃষ্টি না করে, তোমাকে স্পষ্ট বলাই ভাল, মেজ-বউদির দিকে তাকিয়ে সেই মেয়েমানুষের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ক্ষীণ আলোকিত ঘরে, আগুনের মত সেই নগ্ন মূর্তি জেগে উঠছিল আমার চোখের সামনে।

তোমাকে আগেই বলেছি, মেজ-বউদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বন্ধুর মত, কিংবা তারও কিছু বেশী। তার মুখে কোনো কথাই আটকাতো না। নারী এবং পুরুষের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে, মেজ-বউদি অনায়াসে আমার সামনে কথা বলত। যে সব কথা শুনলে, অবিবাহিত ছেলেদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, সেইরকম সব কথা। মেজদা কী রকম নিরীহ ঠাণ্ডা মানুষ, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তার স্বামী যে কত নির্বিকার, সে সব কথা বলতেও সে সঙ্কোচ বোধ করত না। তার কথাবার্তার ধরনটা তোমাকে একটু উদাহরণ দিয়ে জানাই। সে একটা কথা বলত, 'উনুনের একটা গোটা আঁচ জ্বলে গেল, তুমি কোনো রান্না চাপালে না, কী রকম রাঁধিয়ে তুমি?' কথাটার আভ্যন্তরীণ অর্থ তুমি বুঝে নাও, যথেষ্ট স্পষ্ট। তথাপি চর্যাপদের গানের মতই, কথাগুলো অনেকটা সন্ধ্যাভাষার মত। বুঝেও বোঝা যায় না, ইংরেজিতে একে বোধ হয় 'কোড'

বলতে হবে। মেজ-বউদি সকলের সামনে আমার গায়ে হাত দেওয়া বা হাত ধরে টানাটানি করত না। পাছে জ্যাঠাইমার মত সাবেকি মানুষেরা কিছু মনে করেন। কিন্তু আড়ালে অবডালে, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথা বলা, হাত ধরে টানাটানি, এ সব ছিল। আগে কখনো তা নিয়ে আমার কিছু মনে হতো না। কিন্তু সেই আঁধি-ওঠা রাত্রির পরে সবই বদলে গিয়েছিল। মেজ-বউদিকে দেখলে আমার শরীরে পরিবর্তন জাগত। কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে, আগুনের উত্তাপ লাগত।

জ্যাঠাইমা সারাদিন জপ তপ নিয়ে নিবিষ্ট। মেজদা দোকানে। মেজ-বউদি তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে, আমার কাছে ছুটে আসত। কাজই বা তার কতটুকু। অবসরই বেশী। আমি কাশীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি, দরজা বন্ধ করে বই পড়ব, মেজ-বউদির কাছে তা অসহ্য। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই দরজায় ধাক্কা। বইপত্র টেনে সরিয়ে দিত। বলত, 'পড়াশোনা করবার জন্য কলকাতা আছে। কাশীতে দুদিনের জন্য এসে আর এত পণ্ডিতী করতে হবে না।'

মেজ-বউদিকে সমস্ত কথা ভেঙে বলবার উপায় ছিল না। থাকলে বলে দিতাম, তাকে সাবধান করতাম। সেই ঘটনার পাঁচদিন পরে, মেজ-বউদিকে একদিন কঠিন মুখে ধমক দিয়ে উঠেছিলাম, 'কেন আমাকে বিরক্ত করছ। নিজের কাজে যাও।'

ধমকে কাজ হয়েছিল। মেজ-বউদির মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করেছিল। অবাক হয়ে আমার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একটি কথা বলতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত পরেই, তার টানা টানা চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছিল। লঘু পায়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি যেন মনে মনে স্বস্তি বোধ করেছিলাম। সেটা যে কেবল আমারই আত্মরক্ষার কৌশল ছিল তা না, মেজ-বউদিকেও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

প্রায় তিন দিন মেজবউদি আমার সামনে আসেনি, কথা বলেনি। তার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, ব্যথা পাওয়া বা অভিমান হওয়া খুবই

স্বাভাবিক। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম, কলকাতায় ফিরে যাব। সে কথা জ্যাঠাইমা আর মেজদাকেও বলেছিলাম। কারোরই সম্মতি ছিল না। আমি তখন তোমাদের ইস্কুলে পড়াচ্ছি। ইস্কুল খোলার তখনো অনেক দিন বাকি। ছুটির দিনগুলো কাশীতে কাটিয়ে আসি, জ্যাঠাইমা আর মেজদার সেই ইচ্ছা ছিল।

ঘটনার প্রায় দশ দিন পরে, মেজদা জ্যাঠাইমাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিল। কী একটা উপলক্ষে, মেজদার দোকান বন্ধ ছিল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেও বিশেষ উৎসব ছিল। মেজ-বউদি তার শরীর খারাপ এই অছিলায় মন্দিরে যায়নি। অছিলা করেই বলেছিল, আমি জানতাম। আমি তো কোনোদিনই মন্দিরে যাই না। সেজন্য আমাকে জ্যাঠাইমা মেজদা কেউ যেতে বলেনি।

ইতিমধ্যে আমি সকালবেলার দিকে একটু আধটু বেরোলেও, সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরোতাম না। কিন্তু জ্যাঠাইমা মেজদার সঙ্গে মন্দিরে চলে যাবার পরে, আমিও বাইরে যাব, স্থির করেছিলাম। মেজ-বউদিকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখনো আমাদের মধ্যে কথাবার্তা নেই। মেজ-বউদি আমার সামনে আসে না। তাতে আমি খুশি ছিলাম না। কিন্তু উপায় ছিল না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বাড়িতে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।

আমি তৈরি হয়ে বেরোতে যাব, দেখলাম, ঘরের দরজার কাছে মেজ-বউদি এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যায় তখন জোর বাতাস দিচ্ছিল। বাতাবি লেবু আর বেলফুলের গন্ধে, গোটা বাড়িটা ভরে উঠেছিল। মেজ-বউদি চুল বাঁধেনি। তার মাথায় ঘোমটা ছিল না। ফর্সা নিচু মুখের দুপাশে ঘন কালো চুলের গোছা, ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিঠে এলানো। তার মুখের সবটুকু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। জামা-কাপড় তেমন গোছালো ছিল না। মনে হয়, শুয়েছিল, হঠাৎ উঠে এসেছে।

আমি মেজ-বউদির পাশ ঘেঁষে বেরোতে যাচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তেই সে মুখে হাত চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। আমি থমকে

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মেজ-বউদির দিকে তাকিয়েছিলাম।

মেজ-বউদি আরক্ত ভেজা চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে, কান্নার স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি কী করেছি ঠাকুরপো। তুমি আমার ওপর এত রাগ করেছ কেন?'

অবুঝ এবং অসহায় কান্নার প্রশ্ন। আমি কি জানতাম, কুহক সৃষ্টি হচ্ছিল। মেজ-বউদি কুহকিনী হয়ে উঠছিল। অথচ কোনোটাই ইচ্ছাকৃত না। আমার মনটা করুণ হয়ে উঠেছিল। বলেছিলাম, 'না না, তোমার ওপরে রাগ করব কেন?'

মেজ-বউদির কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'আমাকে দেখে যে তুমি এত বিরক্ত হও, রাগ কর, কোনোদিন বুঝতে পারিনি। আগে থেকে কেন একবারও বলনি।'

কী বলে মেজ-বউদিকে বোঝাব, বুঝতে পারছিলাম না। সে আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সেই কান্না দেখে, আমিও কেমন অস্থির এবং আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম। মেজ-বউদির কাঁধে হাত রেখে বলেছিলাম, 'বিশ্বাস কর, আমি তোমার ওপরে একটুও বিরক্ত হইনি, রাগ করিনি।'

মেজ-বউদি হাত দিয়ে মুখ চেপে, মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, 'কী করে বিশ্বাস করব ঠাকুরপো! তুমি যে সেদিন আমাকে রাগ করে ঘর থেকে বের করে দিলে।'

আমি দু হাত দিয়ে মেজ-বউদিকে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, 'বিশ্বাস কর, আমার মনটা খুব খারাপ ছিল।'

মেজ-বউদির কান্না তাতে বাধা মানছিল না। সে অঝোরে কাঁদছিল, আর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলেছিল, 'তুমি ছাড়া, আমি কারোর সঙ্গে এত মিশিনি, এত কথা বলি না। তুমি যদি আমার ওপর রাগ কর, রাগ করে চলে যেতে চাও, তা হলে আমি কী ভাবব, কী করব।'

দুঃখে এবং আবেগে, আমার ভিতরটা যেন থরথর করছিল। আমার দুঃখ এবং আবেগ, বউদির ব্যথা ও কান্না, সবই যে এক নতুন

কুহকের খেলা, সেই মুহূর্তেও আমি বুঝতে পারছিলাম না। মেজ-বউদির চিবুকে হাত দিয়ে, তার মুখটা আমি তুলে ধরেছিলাম। কান্নার আবেগে, তার চোখ মুখ ঠোঁট সবই লাল হয়ে উঠেছিল। তার অটুট উদ্ধত যৌবন আমার শরীরে ছোঁয়ানো। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে, আমার বুকে ছাতিফাটা তৃষ্ণা জেগেছিল। ন্যায়রত্ন মশাই, বাবা, কারোর কথা আর আমার মনে ছিল না। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। আমি মেজ-বউদিকে চুম্বন করেছিলাম।

মেজ-বউদির ঠোঁটে চুম্বন করেই ভেবেছিলাম, একটা ভয়ংকর ধিক্কার এবং প্রতিবাদ উঠবে। কিন্তু কিছুই ওঠেনি। মেজ-বউদি যেন আমার শরীরের মধ্যে আরো নিবিড় হয়ে এসেছিল। আমি আশ্লেষ চুম্বনে, তাকে আরো গভীরভাবে আলিঙ্গন করেছিলাম। কিছু হয়তো বলেও ছিলাম। কী বলেছিলাম, কিছুই মনে করতে পারি না।

মুহূর্তের মধ্যেই, কী ঘটে গিয়েছিল জানি না। কান্নাকাটি মান-অভিমানের মধ্যে, আমরা দুজনেই অন্য এক অনুভূতির জগতে চলে গিয়েছিলাম। আমরা পবস্পরকে সমানভাবে আলিঙ্গন করেছিলাম। মেজ-বউদি যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে নিবিড় এবং সহজ করে তুলেছিল। বিস্ময় প্রতিবাদ কিছুই ছিল না। যেন সমস্ত ঘটনার একটা স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছিল, এবং নিয়তির অমোঘ সংকেতেই, আমরা ঘরের মধ্যে, খাটের বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।...

দেখো সাহিত্যিক, এ ঘটনাকে যেন কোনো প্রেমের ঘটনা মনে করো না। ভালবাসা প্রেম কাকে বলে, আমি জানি না, বিশেষতঃ স্ত্রী-পুরুষের প্রেম ভালবাসা। আমি শুধু দেহ-ই জানি, দেহেরই পূজারী, এবং তা বিবাহিতা নারী অথবা বেশ্যার। মন নিয়ে তোমার কারবার। অতএব বুঝতেই পারছ, মেজ-বউদি যেহেতু বারোবধূ নয়, সেইহেতু, আমার কাছে তার দাবীও বেশী ছিল। সেই দাবীর খোয়ারি কাটাতে আমার বহুকাল লেগেছিল। কারণ মেজ-বউদির কাছে সেটা ছিল প্রেম। আমার কাছে দেহের গ্রাসের ক্ষুধা মেটানো।

প্রথম দু-একটি বছর এসব নিয়ে খুবই অন্তর্দাহের মধ্যে কেটেছে। তারপরে আর সে দাহ ছিল না। কিন্তু এসব কাহিনী বাড়িয়ে, আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না।

এই তৃতীয় যামিনীতে জীবনের এদিককার অংশটা সবই শেষ করে দিতে চাই আমি। দেখছি, আজ সত্যি নিশির ডাকটা আমাকে দেহোপজীবিনীর বারোবাসরে টেনে নিয়ে গেল না। এমন যে কখনোই হয় না, তা নয়। তা ছাড়া অনেক সময়, বাইরে বিদেশে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে থাকলে, আমার ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যেতে পারি না।

কিন্তু রাহুগ্রস্ত শুক্রের জয়যাত্রার বিবরণ আমি অন্যভাবে তোমার কাছে বাড়াব না। তুমি বুঝতেই পারছ, আমার জীবনযাত্রা কোনদিকে বইতে শুরু করেছিল? এই জীবনযাত্রায়, মেজ-বউদি একমাত্র ব্যতিক্রম যে দেহোপজীবিনী নয়। তা ছাড়া আমি একই পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। বারোবাসরের সব মুখই যে ভুলে যাবার কথা, তা নয়। কোনো কোনো মুখ কখনোই ভুলতে পারব না। সে জন্যেই তোমাকে কুসুমের কথাটা বলব।

কুসুম বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিন্তু ওকে আমি দেখেছিলাম কলকাতারই বারোবাসরে। তখন বোধহয় আমার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স। কুসুমের বয়স কত, কে জানে। পঁচিশ ছাব্বিশ হবে হয়তো। তখন আমি কলেজে জয়েন করেছি। সে সময়টা কুসুম আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আমার দিক থেকেও সম্ভবত কুসুমের প্রতি একটা ঘোর এসেছিল।

তোমাকে আমি আগে বলেছি, বিবাহিতদের এরা বেশী পছন্দ করে, একটা জিতে নেবার মনোভাব তাদের মধ্যে থাকে এইভাবে যে, ঘরের বউকে ভাল লাগেনি বলেই আমার কাছে এসেছে। ঘরের বউয়ের থেকেও এ লোকটি আমাকে বেশী চায়। তা ছাড়া,

স্ত্রী থাকতেও কেউ এসেছে, এটাও ওদের মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া করে। যাদের নেই, তারা তো আসবেই।

এর মধ্যে আর একটা কথা আছে। এদের মধ্যে কেউই যে ঘর চায় না, সংসার চায় না, তা সত্যি নয়। অনেকেই চায়। সে জন্যে, কোনো বিবাহিত লোক পেলে এরা ধরেই নেয়, যাক তবু জানা গেল, লোকটা বিবাহিত, এর কাছে আমার চিরদিনের কোনো আশা নেই। কিন্তু অবিবাহিতদের সম্পর্কে এদের যতটা বিরাগের কথা বলেছি, ততটা বোধহয় সত্যি নয়। নয়, এই কারণেই, যাদের এখনো ফিরে আসার ইচ্ছে আছে, এবং বিশ্বাসও করে সে ফিরে যেতে পারবে, তাদের কাছে অবিবাহিত যুবকের মূল্য আছে।

কুসুম আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করেছিল। কুসুমের কাছে পর পর কয়েকদিন যাবার পর, সে আর আমার কাছ থেকে টাকা নিতে চাইত না। চাইত না তো বটেই, দিতে গেলে আপত্তি, পরে রাগ করত। কথা দিয়ে না গেলে, কষ্ট পেত। অন্যান্য মেয়েদের কাছে শুনতাম, সে ঘরে কোনো লোক নেয়নি, আমারই পথ চেয়ে বসেছিল। এসব শোনার পরে আমার মনের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়া ঘটছিল। কুসুম দেখতে খারাপ ছিল না, মেয়েও সে ভাল ঘরেরই ছিল, একবার কোনো কারণে পা পিছলেই, তাকে, সমাজের বাইরে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু সে রীতিমত বাড়ি যাতায়াত করত। অর্থসঙ্গতি ওর বেশ ভালই ছিল। প্রায় বিশ হাজার টাকা ওর ব্যাংকে ছিল, একটা বাড়ি কিনেছিল, কিছু গহনাও ছিল। ও বলেছিল, আমি যদি ওকে বিয়ে করি, তবে এ পথ থেকে ও সরে আসবে, আমার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে, আমি যেমন চাইব, ঠিক তেমনি করে ও নিজেকে সঁপে দেবে।

তারপরে ও করুণভাবে প্রার্থনা করতে লাগল, আমি যেন ওকে ছেড়ে না যাই, আমি যেন ওকে গ্রহণ করি। ও আমাকে ভক্তি তো করতই, আমাকে দেখা মাত্র ও এমন আত্মহারা হয়ে উঠত, গোটা বাড়ির লোক জানতে পারত, কুসুমের ঘরে ওর সেই লোক

এসেছে। ও যে কীভাবে আমার সেবা করবে, যেন ভেবে পেত না।

আমি নিজেকে বিশ্বাস করেছিলাম, তা সত্যি নয়, তবে ভাবাবেগের মধ্যে স্বীকার করেছিলাম, ওকে আমি গ্রহণ করব। কিন্তু আমার অশুভ ভবিষ্যতের কথা ও কিছুই জানত না। আমার পক্ষে সে কথা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসার দিক থেকে এমনিতেই ওর সমালোচনা হচ্ছিল। আমি ছাড়া আর কোনো লোককেই ওর ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল।

কিন্তু নিশির ডাকের সাড়া দিতে, আমি রীতিমত ওর ওখানে যেতাম না। আমি যেদিন না যেতাম, সেদিনই প্রচণ্ড মদ্যপান করে, চীৎকার চেঁচামেচি করে, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, কেঁদে কেটে বীভৎস কাণ্ড বাধিয়ে তুলত। আর এসব ঘটনাই, আমাকে আরো বেশী বিরক্ত করে তুলত, এমনকি ভাবিয়ে তুলত, কুসুম হয়তো আমার সম্মানের হানি করবে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা আমার ওপরেই বিরূপ হচ্ছিল, তাদের সমর্থন কুসুমের দিকেই। এমনকি, এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম, সে বাড়ির কোনো মেয়ে তাদের ঘরে আমাকে ঢুকতে দিতে নারাজ ছিল। এ ধরনের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কারণ, তাদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা-বুঝি ছিল, আমি কুসুমের লোক, আমাকে কেউ তার ঘরে তুললে সেটা হবে রীতিবিরুদ্ধ কাজ। আমাকে সবাই দাদা বলে ডাকত, এবং অস্বীকার করব না, তারা সকলেই আমাকে দাদার মতন ভক্তি-শ্রদ্ধা করত।

তারপরে কুসুম হঠাৎ একদিন কলেজে ফোন করে বসেছিল। কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি ভীষণ ভীত, চিন্তিত, বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেইদিন রাত্রেই তাকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম, সে যেন ও ধরনের পাগলামি আর না করে, এবং সে যা চায়, সে আশা পূরণ করা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কুসুম প্রচণ্ড মদ খেয়ে, সেদিন প্রলাপ বকেছিল। আমি

শুনেছিলাম, ওর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে ব্যাংকের টাকা ভাঙাতে আরম্ভ করেছিল। আমি যেদিন ওকে ওসব কথা বলে এসেছিলাম, তারপর থেকে কয়েকদিন নাকি কেবল মদই খেয়েছিল। তারপরে কুসুম কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

কুসুম কেন কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, আমি যেন কিছুটা তা আন্দাজ করতে পারি। যে পরিমাণে তার জ্বালা ছিল, তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী আগুনে তার জ্বলবার দরকার ছিল। পুড়ে মরার মধ্যে সে তার দুঃসহ দহনকে অনুভব করতে পেরেছিল। সে শান্তির জন্য মরেনি, সে পুড়তে চেয়েছিল।

কুসুমের মৃত্যুর জন্যে আমাকে কেউ দায়ী করবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এ কথা সত্যি, আমি আমার দায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারি না। পরে আমি জেনেছি, এ সব মেয়েদের পক্ষে, কুসুমের ঘটনা খুব একটা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও ঘটেছিল, পরেও ঘটেছে।

সাহিত্যিক, বৃত্তান্ত জ্ঞাপনের এই তৃতীয় যামিনীতে, আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ দিয়ে আমি শেষ করব। বৃন্দাবন ন্যায়রত্নের ভবিতব্য ঘোষণা অনুযায়ী, আমি বোধহয় আমার রাহুগ্রস্ত শুক্রের হাত থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছি। তোমার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই, আমি যদিও সবটাই ভাগ্যের বিধান বলেই তোমার কাছে ব্যক্ত করলাম। এবং তোমার কাছে ব্যক্ত করার ভিতর দিয়েই বোধহয় মুক্তির প্রথম সূচনা ঘটল।

কিন্তু আর একটা কথা আছে। যে কুমারী প্রিয়ংবদার দিকে আমি কখনো আমার প্রেম বল, কামনা বল, সেরকম চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখিনি, ওর বিয়ের পর কিন্তু আমি তাই দেখেছিলাম। নিতান্ত আত্মসম্মানের ভয়েই, কখনো প্রিয়ংবদার কাছে তা প্রকাশ

করিনি। তুমি হয়তো জান কিংবা জান না, বছরখানেক ও বিধবা হয়ে, ছেলেমেয়ে নিয়ে পিত্রালয়েই বাস করছে। ও এখানে এসে কেন বাস করছে, আমি জানি।

ওর সৌভাগ্য বল, দুর্ভাগ্য বল, ওকে ছেড়ে যাবার জন্যে, ওর দেহকে ছেড়ে যাবার জন্যে যৌবনের যে কোনো ব্যস্ততা আছে, এমন মনে হয় না। যাই যাই ভাবের গড়িমসি সে করছে, তাও নয়; সত্যি বলতে গেলে বলতে হয়, সে যেন এখনো বেশ নিবিড় হয়েই ওকে আঁকড়ে ধরে আছে।

ইদানিং আমার নারীহীন সংসারে ওরই একমাত্র অবাধ গতি। আমি ওর চোখের মধ্যে কখনো কোনো অবৈধ বিকৃত ক্ষুধার ঝিলিক দেখিনি। বরং একটি প্রীতি ও স্নিগ্ধতা ভরে, তার মধ্যে ও একটি বিষণ্ণ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমার দিকে তাকায়। ও যেন আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চায়, পারে না। কি যেন বলতে চায়, মুখ ফুটে বলতে পারে না। কোনো কোনো দিন, এ বাড়ি, ওদের বাড়ি, যাঁরা আর নেই তাঁদের কথা তুলে চোখের জল ফেলে যায়। আমার যেন মনে হয়, কাঁদবার কারণটা ওর ভিন্ন, মৃতদের প্রসঙ্গ একটা আড়াল মাত্র।

সাহিত্যিক, আমার নিজেকে আমি চিনি। যে বিবাহিতা প্রিয়ংবদাকে দেখে, আমি মনে মনে তাকে কামনা করেছিলাম, ও বিধবা হয়ে আসার পর, যে অধিকার অতি সহজেই আরোপ করার সুযোগ ছিল আমার, সে অধিকারবোধ কোনো কাজ করল না। আমি ওকে সেই ভাবে কামনা করতে পারলাম না, অথচ ওর দেখা পাওয়াটা, ওর আসা-যাওয়াটা আমার পক্ষে, আমার চোখ ও কানের উৎকর্ণ ঔৎসুক্যে পরিণত হয়ে গেল।

কিন্তু ওর চোখে বিষণ্ণ বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা আমার ভিতরের অন্ধকারকে কোথায় যেন আলোড়িত করতে লাগল। আমার মনে হয়েছিল, অমর্তের কাছ থেকে ও আমার জীবনের কোনো সংকেত পেয়েছে। অমর্তের সঙ্গে ওর বড় ভাব।

তোমাকে সব কথা জানাব, এই সিদ্ধান্তের পর, গত কয়েকদিন আগে এক ছুটির দিনের দুপুরে, আমি প্রিয়ংবদার কাছে নিজেকে ব্যক্ত করেছি। সব না হলেও, মূলে কোথাও গোলমাল রাখিনি। ও যখন আমাকে হঠাৎ বলে উঠল, 'প্রায়ই দেখি, অনেক রাত্রে ফেব। আমি জানালায় বসে থেকে দেখি। কোথায় যাও অরবিন্দ-দা ?'

আমি যেন মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে উঠলাম, 'তুই জানতে চাস ?'

বলেই, আমার কথা ব্যক্ত করলাম। ও মুখ নিচু করে কাঁদছিল, কিন্তু, ওর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক, এইখানে এসেই, বিস্ময়ে আমি পাথর হয়ে গেলাম, যখন আমি প্রিয়ংবদার রুদ্ধ গলায় উচ্চারিত হতে শুনলাম, 'আমি জানি, আমার জন্যেই তোমার আজ এই অবস্থা।'

আমি বলে উঠলাম, 'সে কি, তোমার জন্যে কেন ?'

প্রিয়ংবদা কিন্তু আশ্চর্য বিশ্বাসে তেমনি করেই বলল, 'আমাকে পাওনি বলে, আমাকে কখনো বলতে পারনি বলে !'

এ কি আশ্চর্য কথা! এ কি আশ্চর্য স্থির বিশ্বাস। ভাবলাম, এর পরে না জানি আরো কী কথা বলে বসবে প্রিয়ংবদা। আমি ওর দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। ও আস্তে আস্তে মুখ তুলল, দেখি, ভেজা চোখ দুটিতে সেই প্রীতি ও স্নিগ্ধতা। ওর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে কোনো আবিলতা আছে, তাও আমার মনে হলো না। এই মুহূর্ত পরেই, ওকে অন্যরকম কিছু ভুল বোঝবারও কোনো চিহ্ন নেই। বলল, 'অরবিন্দ-দা, জীবনের বিচারে আমরা কে কী পেয়েছি, জানি না। তবে, আমার ছেলেমেয়েদের আমি ভালবাসি, ওরা আমার পেটের সন্তান।'

আমি যেন প্রিয়ংবদাকে বুঝেও বুঝতে পারছিলাম না। জীবনেব বিচারে আমরা কে কী পেয়েছি, এই কথার দ্বারা যেন ও আমাকে আর এক সূত্রে টেনে নিয়ে গেল, যে সূত্র ধরে ওর জীবনটা এক মুহূর্তে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ও আবার বলল, 'কিন্তু এবার ফেরো, আমার ভেতরটা যেন অপমানে পুড়ছে। কিন্তু দোহাই, আমাকে ভুল বুঝো না।'

বলে চলে গিয়েছিল। তারপরে আবার যেমন যাওয়া-আসা, তেমনি চলছে।

একে কী বলে সাহিত্যিক? তোমাদের তত্ত্বে কি এর কোনো ব্যাখ্যা আছে? জানতে ইচ্ছে করে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমাকে সকল কথা জানাবার সিদ্ধান্তেই যে মুক্তির সূচনা ঘটেছিল, প্রিয়ংবদা নিজে এসে যেন, সেই সূচনার পরে, নতুন পরিচ্ছেদকে স্পষ্ট করে মেলে দিয়েছে।

আমার শেষ প্রশ্নটার ইতি এখানেই নয়। হয়তো আমার জীবন বৃত্তান্তের বিষয়ে, তোমাকে আরো অনেক কথা লিখে জানাতে পারতাম। তাতে বৃত্তান্ত বাড়ত, নতুন তথ্য কিছু পাওয়া যেত না।

জীবনের বাস্তব রূপায়ণে তুমি বিশ্বাসী। মানুষকে আবিষ্কারের অর্থ, সাহিত্যে তোমার নিজের অস্তিত্বের সত্যকে সন্ধান করা। পৃথিবীতে জটিলতর বিষয় অনেক কিছু আছে। মানুষ জটিলতম। তার ভিতরে বিস্ময়কর ব্যাপারের শেষ নেই। তোমার কি মনে হয় সাহিত্যিক, আমার জন্মলগ্নে, গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থানগত কারণে, যে-ভবিতব্য আমার জন্য লেখা ছিল, তাই পূর্ণ হয়েছে? ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কয়েকটি আশ্চর্য কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি আমার ভগ্নিপতির মৃত্যু ঘোষণা, তাঁর নিজের গোমাংস ভক্ষণে মৃত্যু। আমার জীবনেও কি সেইরকম ভবিতব্যই ফলে গেল। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?

আমার নিজের একটা ভাবনা আছে। সে কথাও তোমাকে জানাই। আমার উপনয়নের সময়, যখন প্রথম ন্যায়রত্নমশাইয়ের কথা শুনেছিলাম, তখন থেকেই একটা কিসের ছায়া যেন আমার পিছু পিছু ঘুরেছে। সে ছায়া বাইরের নয়, ভিতরের। আমার

ের সেই ছায়াটির আসল মূর্তি যে কী বা কেমন, তা আমি
ত পারিনি। কিন্তু কাশীর ঘাটে প্রথম যে ঘটনা ঘটেছিল, তার
ছায়াটার কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে। কারণ
পর থেকে আমি আর সেই ছায়াটিকে, আমার ভিতরে পা টিপে
া চলতে দেখিনি। সে বোধহয় তখন সদরে এসেছিল।

তোমার কি মনে হয়, ভবিতব্যের কথা শুনে, আমার অবচেতনে
ভবিতব্য ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।

তোমার মতামত জানবার অপেক্ষায় থাকলাম।